শরৎসাহিত্য পাঠ
আজও কেন প্রাসঙ্গিক

প্রভাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

Saratsahitya path ajo keno prasangik — Provash Ghosh

শরৎসাহিত্য পাঠ আজও কেন প্রাসঙ্গিক — প্রভাস ঘোষ

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ মে, ২০১৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৬ আগস্ট, ২০১৪
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ ১ অক্টোবর, ২০১৫

প্রকাশক ঃ মানিক মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (সি)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ **২৫ টাকা**

প্রকাশকের কথা

শরৎচন্দ্রের ১৩৮তম জন্মদিবসে পথিকৃৎ, এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও, এ আই এম এস এস এবং কমসোমল সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ১৭ সেপ্টেম্বর '১৩ মহাজাতি সদনে আয়োজিত আলোচনা সভায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এই বক্তব্যটি রাখেন।

পরবর্তীকালে কমরেড প্রভাস ঘোষের কিছু সংযোজন ও সংশোধন সহ পূর্ণাঙ্গ আলোচনাটি গত ২০ মে'১৪ প্রকাশ করা হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম মুদ্রণের সমস্ত কপি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হয়। এই মুদ্রণেও কমরেড প্রভাস ঘোষ কিছু প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজন করেন। বর্তমানে পুস্তিকাটির তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হল। সম্পাদনাজনিত ত্রুটি বিচ্যুতির দায় আমাদের।

১ অক্টোবর, ২০১৫
৪৮, লেনিন সরণি
কলকাতা ৭০০০১৩

মানিক মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি
এস ইউ সি আই (সি)

শরৎসাহিত্য পাঠ আজও কেন প্রাসঙ্গিক

প্রভাস ঘোষ

আমি সাহিত্যিক নই, সাহিত্য সমালোচকও নই। আমি দীর্ঘদিন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। শুধুমাত্র বিশ-পঁচিশ বছর আগে এই ধরনের সভায় বা বৈঠকে কখনও কিছু আলোচনা করেছি। বরং আমার বাঁদিকে যে দু'জন বসে আছেন, কমরেড মানিক মুখার্জী ও কমরেড রণজিৎ ধর এ-ব্যাপারে আমার থেকে অনেক বেশি দক্ষ। ফলে, এই ধরনের আলোচনায় অনভ্যস্ততার জন্য কতটা সহজ ও সাবলীলভাবে আমার কথা ব্যক্ত করতে পারব এই নিয়ে আমার দ্বিধা সংকোচ ছিল। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকে লক্ষ করছি, কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী বা যুবক যুবতী, যারা শিক্ষিত, তাদের আমি যখন জিজ্ঞাসা করি, 'তোমরা শরৎ-সাহিত্য পড়েছ', খুবই দুঃখের সাথে বলছি, অধিকাংশই উত্তর দেয়, শরৎ-সাহিত্য তারা পড়ে না এবং মনে হয় তেমন আকর্ষণও বোধ করে না। তাদের মধ্যে একদল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত আছে। এতে খুবই বেদনাবোধ করি।

আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে যে সব রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র পরিচালনা করছে, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা এমন 'অগ্রগতি' ঘটিয়েছে, যার শোচনীয় ফল মানুষ প্রতিদিন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তারা ওই একই রকম সর্বনাশা 'অগ্রগতি' ঘটিয়েছে। শুধু শরৎচন্দ্র নয়, রবীন্দ্রনাথের নাম তো বহুবার উচ্চারিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সাথেও কার কতটুকু যোগাযোগ আছে? চর্চা যেটুকু হয় তাও শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত। তার মধ্যে আবার শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক, প্রকৃতি ও প্রেম—এর মধ্যেই বেশিরভাগ ঘোরাফেরা করে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে প্রকৃতি, ধর্ম, প্রেম নিয়েই কাব্যে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও শেষ জীবনে তাঁর হাত দিয়েই 'পৃথিবী', 'আফ্রিকা', 'ঐকতান'-এর মতো কবিতাও বেরিয়েছিল। এ সম্পূর্ণ আলাদা রবীন্দ্রনাথ। এ রবীন্দ্রনাথকে ক'জন চেনে? কী আর্তনাদ ফুটে উঠেছিল তাঁর শেষ জন্মদিনের ভাষণ 'সভ্যতার সংকট'এ? স্বদেশি আন্দোলনে 'অহিংসা' ও 'শান্তিপূর্ণ' পন্থায় বিশ্বাসী হয়েও কী দেখে এবং কোন

উদ্বেগে মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি লিখেছিলেন, 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস। যাবার আগে তাই, ডাক দিয়ে যাই, দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে, প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে'। জীবনের শেষ অধ্যায়ে কেনই বা তিনি রুশ সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়নকেই, ফ্যাসিস্ট জার্মানির ও ইতালির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একমাত্র নির্ভরযোগ্য গণ্য করেছিলেন? ক'জন রবীন্দ্রপ্রেমিক এসবের খবর রাখেন? ফলে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র তো বিস্মৃতির অতলে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আক্রমণ আরও ভয়ঙ্কর।

শরৎচন্দ্রও বিস্মৃতপ্রায়। ফলে প্রথম দিকে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও এই দুঃখ ও ব্যথার তাড়নায় এবং অনেকটা আবেগে আমি এই সভায় কিছু বলতে রাজি হয়েছি। আর আমি স্থির করেছি শরৎ সাহিত্য নিয়ে অল্প কিছু বলব, মূলত আমি শরৎচন্দ্রেরই কিছু বক্তব্য পড়ে শোনাব, কিছু ব্যাখ্যাও করব। জানি না শেষ পর্যন্ত আপনাদের ধৈর্য থাকবে কি না। সাহিত্য আলোচনার আসর এটা নয়, এতে হয়তো একদল সাহিত্যপ্রেমী হতাশ হবেন। কিন্তু আমি বিশেষ কারণে এভাবেই ভেবেছি। এই সভায় সকলের অনুমতি নিয়ে আমি এভাবেই বলতে চাই।

শরৎ সাহিত্যের সাথে যখন আমার প্রথম পরিচয়, তখন আমি সবেমাত্র শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরের স্তরে পৌঁছেছি। তখন আমাদের মতো অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারে ঠাকুরদা ঠাকুরমাদের পাঠ্য ছিল রামায়ণ-মহাভারত, আমাদের বাবা জ্যাঠারা পড়তেন বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ এইসব। আর দাদা-দিদিরা লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তেন শরৎচন্দ্র। এই লুকিয়ে পড়ার আকর্ষণ দেখেই শরৎচন্দ্রের প্রতি আমার আকর্ষণ। এর আগে যতটুকু গল্প পড়তাম, সেগুলি ছিল ডিটেকটিভ কাহিনী, কিছু হাস্যরসের পুস্তক, এইসব ছোটদের পাঠ্য গল্প। অকস্মাৎ একদিন শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি পড়ার সুযোগ এল। সাহিত্যের মধ্যে যে চোখের জল আছে, গল্প যে কাঁদায়, বেদনার সৃষ্টি করে এবং গভীরভাবে ভাবায়, সেটা এই প্রথম টের পেলাম। এই গল্পে বর্ণিত ঘটনাবলির সঙ্গে পরিচিত না থাকলেও, 'মহেশ' গল্পের চরিত্রগুলি যেন আমাদের গ্রাম্য পরিচিত গণ্ডির মধ্যেই চেনা জানা ছিল। কিন্তু তাদের উপর এরকম নির্মম অত্যাচার অবিচার, তাদের এই মর্মান্তিক যন্ত্রণা, এই চেনা লোকদের এত দুঃখ ব্যথা এতদিন অজানাই ছিল। এভাবেই শরৎচন্দ্রের সাথে প্রথম পরিচয় ঘটল। এরপর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর আরও কিছু বই পড়েছি। তখন সবটা বুঝেছি বা বোঝার মতো বয়স হয়েছিল তা নয়। কিন্তু বার বার পড়বার তীব্র আকর্ষণ বোধ করতাম। সেই সময়েই বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত হলাম। এইভাবে বামপন্থী রাজনৈতিক পথে চলতে চলতে আকস্মিকভাবেই মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে যোগাযোগ ও পরিচয় ঘটল। তাঁর সংস্পর্শে এসেই ধীরে ধীরে শরৎচন্দ্রের সাথে দ্বিতীয়বার পরিচিত হলাম। সেটাই যথার্থ পরিচয়। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেক্যুলার মানবতাবাদী ও বস্তুবাদী,

রেনেসাঁসের ও স্বদেশি আন্দোলনের আপসহীন ধারার সার্থক প্রতিনিধি ও বলিষ্ঠ বিপ্লবী চিন্তানায়ক হিসাবে, সাহিত্যে জ্ঞান সাধনার অসাধারণত্বে, অতুলনীয় শিল্পশৈলীতে কী বিরল প্রতিভাবান শরৎচন্দ্র ছিলেন, এটা বুঝেছি কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য আলোচনা থেকেই। সেই অবিস্মরণীয় মার্কসবাদী বিচারধারা ও মূল্যায়নের আলোকেই তাঁর ছাত্র হিসেবে আজ এই সভায় কিছু কথা আমি বলব।

সাহিত্য জগতে শরৎচন্দ্র প্রকৃতই এক বিস্ময়কর প্রতিভা। শুধু এই বাংলার নয়, শুধু এই ভারতবর্ষেরও নয়, বিশ্বসাহিত্যেরই তিনি এক বিস্ময়কর প্রতিভা ছিলেন। এ কথা শুধু আমাদের নয়। এ কথা বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী রমাঁ রলাঁ এবং বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের। 'শ্রীকান্ত'-র প্রথম খণ্ড মাত্র পড়েই বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত দার্শনিক, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক রমাঁ রলাঁ বলেছিলেন, সাহিত্য প্রতিভায় শরৎচন্দ্র বিশ্বের অগ্রগণ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম এবং নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্য। আপনারা যাঁরা শরৎচন্দ্রের এই সব পুস্তক পড়েছেন তাঁরা জানেন, শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের চেয়েও শরৎচন্দ্রের অনেক বিস্ময়কর সৃষ্টি আছে। কিন্তু একটা বই পড়েই রমাঁ রলাঁর এই উপলব্ধি হয়েছিল। 'নিষ্কৃতি' উপন্যাস যখন ইংরেজিতে অনুবাদ হয়, রবীন্দ্রনাথ তার ভূমিকায় লিখছেন, শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের প্রথম সারিতে নিয়ে গেছেন। লিখছেন কে? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রঁমা রলাঁর সঙ্গে কথোপকথনে তিনি আরও বলেছেন, শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের সাথে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, সাহিত্য চিন্তায়, রাজনৈতিক মতবাদে শরৎচন্দ্রের অনেক পার্থক্য ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে অনেক বিতর্কও হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বড় মানুষ ছিলেন, বড় প্রতিভা তিনি চিনতেন। মতপার্থক্য সত্ত্বেও যোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়ার মতো বড়ত্ব তাঁর ছিল। এই রবীন্দ্রনাথই বলেছেন, "শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরাণ আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশি হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি! অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।"[১] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর প্রথম জীবনে ছিল, বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগ। তখন বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষে। তিনি তখন কনিষ্ঠ। পরবর্তীকালে তাঁকে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে ভিত্তি করে দ্বিতীয় যুগ শুরু। আবার রবীন্দ্রনাথই বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই শরৎচন্দ্র সাহিত্যের তৃতীয় যুগের সূচনা করেছেন। এখনকার অনেক রবীন্দ্রভক্ত পণ্ডিত আছেন যাঁরা এইসব হয়তো জানেন না, বা জানলেও হয়তো বলতে চান না। আমি রবীন্দ্রনাথের কথাই বলছি, তিনি বলছেন, "তৃতীয় পর্বের আরম্ভ হয়েছে শরৎকে নিয়ে। আধুনিকের সঙ্গে তাঁর যেমন নৈকট্য ঘটেছে, তাঁর পূর্ববর্তীদের আর কারও তেমন ঘটেনি। তিনি সম্পূর্ণভাবেই নিজের দেশের ও কালের। এটা সহজ

কথা নয়"।[২] পরবর্তীকালে সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সন্তোষ ঘোষ ইত্যাদি প্রত্যেক সাহিত্যিকই একবাক্যে বলেছেন, শরৎচন্দ্র যে পথনির্দেশ করে গেছেন আমরা সেই পথেই সাহিত্য রচনা করছি। এঁরা সকলেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু একদল তথাকথিত পণ্ডিত, সমালোচক আছেন, তাঁরা আবার রবীন্দ্রভক্ত বলে দাবি করেন এবং এদের সাথে তথাকথিত কমিউনিস্ট অবিভক্ত সিপিআই, যার বংশধর সিপিএম ও নকশাল রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত সাহিত্য-সমালোচকরাও আছেন, যাঁরা কতগুলো প্রশ্ন তুলে ও ভুল তত্ত্ব এবং তথ্য পরিবেশন করে মানুষের মধ্যে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছেন। যেমন বলেছেন, শরৎচন্দ্রের মধ্যে হৃদয়বৃত্তি আছে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি নেই, তিনি রসস্রষ্টা ছিলেন, কিন্তু জীবনদ্রষ্টা ছিলেন না, প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু উত্তর দেননি, তিনি সমস্যা দেখিয়েছেন, কিন্তু সমাধান করেননি। আর তথাকথিত মার্কসবাদীরা আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন, শরৎচন্দ্র পেটিবুর্জোয়া সাহিত্যিক ছিলেন, ফলে তাঁর দোদুল্যমানতা ছিল, সেইজন্য আপসমুখিনতা কাজ করেছে। এই সমস্ত বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রথম যিনি যথার্থ শরৎচন্দ্রকে দেশের সামনে উপস্থিত করেছেন তিনি হচ্ছেন মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনিই দেখিয়েছেন শরৎচন্দ্র ছিলেন সেক্যুলার মানবতাবাদের এবং আপসহীন বিপ্লবী ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তিনি দেখিয়েছেন, উপন্যাস সাহিত্যে শিল্পশৈলী ও রসসৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র বিশ্বসাহিত্যে অদ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আর বলেছেন, দর্শন চিন্তায় শরৎচন্দ্র মূলত বস্তুবাদীই ছিলেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে এই শরৎচন্দ্রের অভ্যুত্থানও ছিল একটি বিস্ময়কর ঘটনা। শরৎচন্দ্র ছোটবেলায় কিছু সাহিত্যের চর্চা করতেন ভাগলপুরে তাঁর মামার বাড়িতে থাকাকালীন। ছোটদের একটা সাহিত্য গোষ্ঠী পরিচালনা ও হাতে লেখা ম্যাগাজিন প্রকাশ, এইসব করতেন। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর দিন গেছে। রাজেন্দ্র কলেজে ছাত্রদের ডাকা সংবর্ধনা সভায় শরৎচন্দ্র একদিন বলেছিলেন — "...আমারও একদিন তোমাদের মতোই উচ্চশিক্ষার আশা নিয়ে এমনি করে ছাত্রজীবন শুরু হয়েছিল, সেদিন মনে মনে ভাবীকালকে স্মরণ করে কত আশার মুকুলই না রচনা করেছিলাম! কিন্তু স্বপ্ন যত বড় ছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য থেকেও ঠিক ততখানিই বঞ্চিত হলাম।... বিদ্যামন্দিরের উদ্দেশ্যে দূর থেকে নমস্কার জানিয়েই একদিন ভবঘুরে হলাম।" লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছেন, — "বড় দরিদ্র ছিলাম, — ২০ টাকার জন্যে একজামিন দিতে পাই নি। এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান, আমার কিছুদিনের জন্যে জ্বর করে দাও, তাহলে দুবেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপোস করেই দিন কাটবে।" চরম দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়েছে। বাবা মায়ের মৃত্যুর পর ভাইবোনদের বিলিয়ে দিয়েছেন আত্মীয়দের মধ্যে,

চলে গেছেন বর্মায় চাকরি খুঁজতে। বলেছেন, কোনও দিন যে সাহিত্যে চর্চা আমি করেছি, তা ভুলেই গেছি। আকস্মিকভাবে তাঁর অল্পবয়সের একটা লেখা বড় গল্প 'বড়দিদি', তাঁর এক বন্ধু 'যমুনা' কাগজে বার করেছিলেন। শরৎচন্দ্র সেটা জানতেনও না। কিন্তু এই একটা লেখাই সাহিত্য জগতে ঝড় সৃষ্টি করল। বড় বড় সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদকেরা রবীন্দ্রনাথকে ধরলেন, আপনি আমাদের না দিয়ে অন্য পত্রিকায় বেনামে কেন লিখলেন? রবীন্দ্রনাথ যত বোঝাচ্ছেন আমি লিখিনি, তারা বিশ্বাসই করতে চায় না। তারপর শরৎচন্দ্রের বন্ধুরাই 'মন্দির', 'কাশীনাথ', 'দেবদাস' এইসব পরপর বের করতে শুরু করলেন, যেগুলো শরৎবাবুর অল্প বয়সেরই লেখা। বাংলা দেশে তাঁর সাহিত্য নিয়ে এভাবে যে ঝড় উঠেছে, শরৎচন্দ্র সে খবরও জানতেন না। আরও বেশ কিছুদিন পরে বাংলা সাহিত্যের আসরে তিনি অবতীর্ণ হলেন। তখন তাঁর জীবনের প্রৌঢ়ত্বের প্রথম ধাপ। তাঁর এই অসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টি, যা আমরা দেখি, সে সব লেখা দশ-বারো বছরের মধ্যেই। এই স্বল্প সময়ই তাঁর সাহিত্য জীবন। লেখক রমাপদ চৌধুরী বলেছেন, শরৎবাবুর বইগুলো একমুঠোর মধ্যে ধরা যায়, সামান্য কয়েকটা বই, আর আমরা যত বই লিখছি সেগুলি গাড়ি করে পাঠাতে হয়। তিনি বলছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই কয়েকটা বইয়ের যা প্রভাব, সেটা বছরের পর বছর, যুগ যুগ ধরে চলবে, এর কোনও সীমা পরিসীমা নেই। আপনারা অনেকে হয়তো জানেন, শরৎচন্দ্রের বইগুলি সেই সময়, স্বদেশি আন্দোলনের যুগে, ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল, বারবার সংস্করণ বের করতে হয়েছিল। তাঁকে ভিত্তি করে এমন একটা চিন্তাও গড়ে উঠেছিল যে অন্ধ্রের লোক মনে করত শরৎচন্দ্র আমাদের রাজ্যের, মারাঠিরা মনে করত শরৎচন্দ্র আমাদের রাজ্যের, গুজরাটিরা মনে করত শরৎচন্দ্র আমাদের রাজ্যের, হিন্দিভাষীরা মনে করত শরৎচন্দ্র আমাদের এলাকার। হিন্দি সাহিত্যিক বিষ্ণুপ্রভাকর তাঁর একটা বইতে এ রকম অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। আমি নিজেও দেখেছি, বিভিন্ন রাজ্যে যখন যাই, আমাদের বয়সী যাঁরা বৃদ্ধ, যাঁরা প্রৌঢ়, তাঁদের অনেকেরই ধারণা শরৎচন্দ্র তাঁদেরই রাজ্যের সাহিত্যিক। ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও কতটা মর্ম স্পর্শ করতে পারলে এমন হয়! যা ইতিপূর্বে এদেশে ও বিদেশে কোনও সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই ঘটেনি। ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এতটা অন্তর কেউ জয় করতে পারেনি। সেটা বাংলার সীমা ছাড়িয়ে গোটা ভারতবর্ষে চলে গিয়েছিল। আর দু'একখানা বই যা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে গেছে তা নিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত রমাঁ রলাঁর বক্তব্য কী, সেটা আগেই বলেছি।

শরৎচন্দ্রের সময়টা ছিল আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগ। সামন্ততন্ত্র বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনও সে সময়ে continue করছিল, যাকে বলা হয় নবজাগরণের আন্দোলন। রাজনৈতিক আন্দোলনের সেই সময় দুটি ধারা যেমন ছিল, নবজাগরণেরও তেমনি দুটি ধারা ছিল। এ দেশে নবজাগরণের সূচনা রামমোহনকে দিয়ে আপনারা জানেন। ইউরোপেই প্রথম এই

রেনেসাঁস শুরু হয়েছিল। নবজাগরণ হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা, মধ্যযুগীয় মানসিকতা, আধ্যাত্মিক চিন্তা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার আন্দোলন। নবজাগরণের চিন্তা হল, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মনুষ্যত্ব দিয়েই মানুষের পরিচয়। ব্যক্তির স্বাধীনতা, নারীর স্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকার, নারীর অধিকার এই সমস্ত কিছু নিয়ে ইউরোপে যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, তারই পরিণতিতে ফরাসি বিপ্লব, ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব, জার্মানিতে পিজেন্ট ওয়ার সংগঠিত হয়েছিল। এগুলির মধ্য দিয়ে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রাজনৈতিক বিপ্লবের আগে তার উপযোগী মানসিকতা গঠনের প্রস্তুতি হিসাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনই হচ্ছে নবজাগরণ। যে কোনও রাজনৈতিক বিপ্লবের আগে তার মনন, তার ভাবধারা মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য প্রয়োজন হয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন। রেনেসাঁস বা নবজাগরণ হচ্ছে ঠিক তাই। ইউরোপে তার সূচনা থেকেই নবজাগরণ সম্পূর্ণ ভাবে ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। যান্ত্রিক বস্তুবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, সেক্যুলার মানবতাবাদকে ভিত্তি করে সেই সময় বেকন, স্পিনোজা, কান্ট, ফুয়েরবাখ এইসব দার্শনিকরা চার্চের আধিপত্যের বিরুদ্ধে, খ্রিস্ট ধর্মের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিক মনন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছেন। সাহিত্যের জগতেও ভিক্টর হুগো থেকে শুরু করে সেই সময় যাঁরা লিখেছেন, বা রুশো, ভলটেয়ারের মতো চিন্তাবিদরা সকলেই সেক্যুলার মানবতাবাদী চিন্তা নিয়ে এসেছিলেন। পুশকিন, ভিক্টর হুগো, দস্তয়েভস্কি, তুর্গেনেভ, এমিল জোলা, চেখভ, মপাসাঁ ইত্যাদি সকলেই তাই করেছেন। টলস্টয় আপসমুখী হলেও তাঁর মধ্যেও মানবতাবাদের প্রবল প্রভাব ছিল। এঁরা সকলেই নবজাগরণের চিন্তাকে বহন করেছেন। আমাদের দেশে এই নবজাগরণের চিন্তা নিয়ে এসেছেন রামমোহন। তাঁর ভূমিকা অনেকটা মার্টিন লুথারের মতো। ইউরোপে নবজাগরণের সূচনা ঘটেছিল মার্টিন লুথারকে দিয়েই, কিন্তু তিনি ধর্মীয় সংস্কারের পথে এগিয়ে ছিলেন। তেমনই এদেশেও নবজাগরণের গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা আসছে, কিন্তু ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত নয় — এই ছিল রামমোহনের অবস্থান। রামমোহনের পরে বিদ্যাসাগরের অভ্যুত্থান ঘটল। বিদ্যাসাগরই প্রথম এদেশে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সেক্যুলার মানবতাবাদের ঝান্ডা তুলে ধরলেন। বিদ্যাসাগরের এই পরিচয় এদেশে অনেকটা অজানা রয়ে গিয়েছে। তিনিই বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, বেদ-বেদান্ত- সাংখ্য-উপনিষদের মধ্যে সত্য পাওয়া যায় না। সত্য পেতে হলে চাই বৈজ্ঞানিক চিন্তা, যুক্তিবাদী মনন, সেটা ইউরোপ থেকে আনতে হবে। ব্রিটিশ সরকার যখন ইউরোপের ভাববাদী দার্শনিক বিশপ বার্কলের 'এনকোয়ারি' বইটিকে এদেশের দর্শনের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইল, তার প্রতিবাদ করে তিনি বললেন, এমনিতেই আমাদের দেশে বাধ্য হয়ে বেদ-বেদান্ত পড়াতে হয়, বার্কলের দর্শন পড়ালে বেদ-বেদান্তের প্রভাব আরও বাড়বে। ফলে ইউরোপের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে যুক্তিবাদী দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

এগুলি পড়ানো দরকার। এই চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের সংগ্রাম করেছিলেন। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ রদ ইত্যাদি যা কিছু তিনি করেছিলেন, নবজাগরণের চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়েই করেছিলেন। বিদ্যাসাগর একটা ধারা, এ ধারাটা আমাদের দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনে কখনও প্রধান হতে পারেনি। তিনি নিজেও এই চিন্তাকে দর্শনতত্ত্ব রূপে আনেননি। তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝা যায়। তিনি চেয়েছিলেন সিলেবাসের মধ্যে বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক দর্শন, লজিক পড়ানো হোক। কারণ, তিনি ভেবেছিলেন, এদেশের ছেলেমেয়েরা যদি এগুলি পড়ে, তাহলে এর মধ্য দিয়ে তারাও বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের প্রভাব থেকে মুক্ত হবে, যেমন তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী দর্শনের প্রভাবে ধর্মীয় চিন্তামুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সেটা এদেশে হয়নি, ব্রিটিশরা তাঁর প্রস্তাবিত সিলেবাস চালু করেনি। বিদ্যাসাগরের সময়েই রামকৃষ্ণ এবং কিছুদিন পরে বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবাদী ধারার উত্থান। বিদ্যাসাগরের অল্প কিছুদিন পর এলেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের চিন্তায় একদিকে বেদান্তভিত্তিক অধ্যাত্মবাদ, আর একদিকে বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদ ছিল। বেদান্ত, ঐতিহ্যবাদ এবং দেশাত্মবোধ ও জাত্যভিমানের শক্তিশালী প্রতিনিধি হিসেবে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। এদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদী ও আপসমুখী রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিনিধি গান্ধিজি ছিলেন। সাহিত্য জগতে বিশাল প্রভাব বিস্তার করে রবীন্দ্রনাথও অধ্যাত্মবাদী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

এরকম একটা পরিবেশে শরৎচন্দ্রের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এই পরিবেশে শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে অধ্যাত্মবাদ ও ঐতিহ্যবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়ালেন। শরৎচন্দ্রকে লড়তে হল বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধিজি ও রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাবের বিরুদ্ধে, ঐতিহ্যবাদের বিরুদ্ধে। এ সবের থেকে মানুষের মননকে মুক্ত করার জন্যই শরৎচন্দ্রের অভ্যুত্থান। ‘পথের দাবী’ উপন্যাসটি শরৎচন্দ্র এদেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে সঠিক ভাবে তুলে ধরার জন্য লিখেছিলেন। আপসমুখী সংস্কারকামী গান্ধিজির নেতৃত্ব নানা অপপ্রচার চালিয়ে বিপ্লববাদকে আঘাত করছিল। বিপ্লবীরা তাঁদের দ্বারা বার বার সমালোচিত ও আক্রান্ত হচ্ছিলেন। সেই বিপ্লববাদকে বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করার জন্য শরৎচন্দ্র ‘পথের দাবী’ লিখেছিলেন, শুধু এইটুকু বললেই হবে না। ‘ পথের দাবী’তে তিনি বিপ্লবীদেরও এমন কতগুলো মূল্যবান শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সেই যুগে বিপ্লবীদের মধ্যেও যে সব চিন্তার চর্চা ও অনুশীলন ছিল না। সে যুগের বিপ্লবীরা অধিকাংশই ছিলেন বিবেকানন্দের ভক্ত। গীতা হাতে নিয়ে তাঁরা ‘যুগান্তর’ ও ‘অনুশীলন’ প্রভৃতি বিপ্লবী সংগঠনের নেতাদের কাছে দীক্ষা নিতেন । ফলে, ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব বিপ্লবীদের মধ্যেও প্রচণ্ড ছিল। শরৎচন্দ্র ‘পথের দাবী’তে সব্যসাচীর কণ্ঠে বললেন — “সমস্ত ধর্মই মিথ্যা —আদিম যুগের কুসংস্কার, বিশ্বমানবতার এতবড় শত্রু আর নাই।” তিনি চেয়েছিলেন, সে যুগের বিপ্লবীরাও যাতে এটা বোঝে। ধর্মীয় চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ

মুক্ত না হওয়ার ফলে, সে যুগে বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা নিয়েও বিতর্ক ছিল। একমাত্র মাস্টারদা সূর্য সেন ছাড়া অধিকাংশ বিপ্লবী দলে নারীদের বিপ্লবী হিসাবে গ্রহণ করেননি, তাঁদের বিপ্লবের সাহায্যকারী ভেবেছেন, এর বেশি নয়। তাও এ নিয়ে মাস্টারদার দলে বিতর্ক, ভাঙন এইসব হয়েছিল। শরৎচন্দ্রই প্রথম 'পথের দাবীতে' বিপ্লবী নারীচরিত্র সুমিত্রাকে সৃষ্টি করে দেখালেন। এই চরিত্রই সূর্য সেনদের প্রভাবিত করেছিল। আবার সে যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে যে চিন্তা আসেনি, সেই শ্রমিক বিপ্লবের চিন্তা শরৎচন্দ্রই প্রথম বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে উপস্থিত করলেন 'পথের দাবী'তে। সে যুগের বিপ্লবী আন্দোলনে যে অসম্পূর্ণতা ছিল সেটা পূরণ করার কথা তাঁর মনে ধাক্কা দিয়েছিল। এক সভায় তিনি বলেছিলেন, সব্যসাচী চরিত্র কাউকে দেখে আমি তৈরি করিনি। তার গুণাবলি অনেক চরিত্র থেকে নেওয়া। ছাত্র-যুবকদের বলছেন, আমার ইচ্ছা-আকাঙক্ষা-কল্পনা তোমরা সব্যসাচী হও। এ আকাঙক্ষা নিয়েই এই পুস্তকটি রচনা করা। যেটা আমাদের কাছে, আজকের দিনের বিপ্লবীদের কাছেও শিক্ষণীয়। এই পুস্তক থেকে বিশেষভাবে শিক্ষণীয় হল — দলের সেরা কর্মীরা পুলিশের গুলিতে নিহত, অনেকে কারারুদ্ধ, কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেছে, কেউ কেউ হতাশাচ্ছন্ন, ফলে ভগ্নপ্রায় দল, আবার কেউ কেউ সব্যসাচী যাকে ছোট বোনের মতো স্নেহ করতেন, সেই ভারতীর সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে মিথ্যা সন্দেহ করছে — এই অবস্থায় 'পথের দাবীর' শেষ অধ্যায়ে, প্রবল ঝড়ের রাতে স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, দুর্জয় সাহসী সব্যসাচী এগোচ্ছেন। প্রগাঢ় অন্ধকারে মুহুর্মুহু আকাশের চমকানো বিদ্যুৎ পথ দেখাচ্ছে। কাঁটা বন দিয়ে যাচ্ছেন, প্রকাশ্য রাস্তায় যাওয়ার উপায় নেই, কারণ সেখানে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি। অদূরে অশান্ত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নদী, সেই নদীতে সব্যসাচী একটা ছোট্ট নৌকায় পাড়ি দেবেন। তাই উপন্যাসের নামটা হচ্ছে 'পথের দাবী'। বিপ্লবী আন্দোলনের পথ এই দাবী করে, তোমরা বিপ্লবীরা পারবে তো! এই প্রশ্ন তুলেছেন শরৎচন্দ্র সেই যুগে। এই প্রশ্ন আজকের যুগেরও।

এবারে শরৎচন্দ্রের দর্শন চিন্তার কয়েকটা দিক তাঁর লেখা থেকে আপনাদের আমি পড়ে শোনাব। আমি আগেই বলেছি, আলোচনা হয়তো মাঝে মাঝে আমি করব, কিন্তু আমার ইচ্ছা মূলত শরৎচন্দ্র থেকেই পড়ে শোনানো। যেহেতু অনেকেই আজকাল বইগুলি পড়েন না, আবার যাঁরা পড়েছেন, তারাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেননি। দর্শনের একটা কথা 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে আছে, সেখানে বলছেন, — "ভালো করিয়া দেখিলে মিথ্যা বলিয়া কোন বস্তুরই অস্তিত্ব এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চোখে পড়ে না।" মানে গোটা বিশ্ব প্রকৃতিটাই সত্য এবং বাস্তব। এখানে মিথ্যা বলে কিছু নেই। বলছেন, 'মিথ্যা শুধু মানুষের বুঝিবার এবং বোঝাইবার ফলটা।" অর্থাৎ মানুষ অজ্ঞতা বা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় এই বাস্তব বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে ভুল বোঝে এবং বোঝায়। সেই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা হলেও যেমন বোঝে, তেমন বোঝায়। কিন্তু এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মিথ্যা বলে কিছু নেই। এই বিশ্ব প্রকৃতির বাইরে

অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে, সেই শক্তি বা ভগবান এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, তার ইচ্ছাই কর্ম, অথবা জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য — এ সব মিথ্যা ধারণা বহুদিন ধরেই চলে আসছে। শরৎচন্দ্র এই মিথ্যা ধারণাকেই আঘাত করলেন। শরৎচন্দ্রের এইসব বক্তব্য, দর্শন সংক্রান্ত চিন্তা, গভীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন। অথচ তিনি গুরুগম্ভীর জটিল আলোচনার মাধ্যমে নয়, সাধারণ সহজ কথার মধ্যেই তা ব্যক্ত করেছেন। শরৎ সাহিত্যে রান্নাঘরে বসেও এমন আলোচনা হয়েছে যাতে অবাক হয়ে যেতে হয়। সবই গল্পের মধ্য দিয়ে, কাহিনীর মধ্য দিয়ে, ডায়ালগের মধ্য দিয়ে বলেছেন। কোথাও পাণ্ডিত্যের বাহুল্য নেই, বাক্যের ঝঙ্কার নেই, তত্ত্বের ঝাঁঝ ও চোখ ঝলসানো আলোচনা নেই, সহজ সরল ভাষায় জ্ঞানজগতের অত্যন্ত কঠিন জটিল সত্যকে মানুষের মনের অন্তঃপুরে পৌঁছে দিয়েছেন। 'পথের দাবীতে'ই আলোচনা করছেন, "তোমরা বল চরম সত্য, — পরম সত্য, এই অর্থহীন নিস্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহামূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এতবড় যাদুমন্ত্র আর নেই। তোমার ভাব, মিথ্যাকেই শুধু বানাতে হয়, সত্য শাশ্বত, সনাতন, অপৌরুষেয়। মিছে কথা। মিথ্যার মতই একে মানবজাতি অহরহ সৃষ্টি করে চলে। শাশ্বত, সনাতন নয়, সত্যেরও জন্ম আছে, মৃত্যু আছে।" অর্থাৎ চিরন্তন সত্য বলে কিছু নেই। এক যুগে যা সত্য পরের যুগে তা মিথ্যা হয়ে যায়। আবার নতুন যুগের প্রয়োজনে নতুন সত্য জন্ম নেয়। আবারও সেই সত্য মিথ্যা হয়ে যায়, পরিবর্তিত যুগের পরিপ্রেক্ষিতে। আবার আসে নতুন সত্য ধারণা। এই হচ্ছে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য। 'চরিত্রহীন'-এ বলছেন "যা সত্য তাকেই সকল সময় সকল অবস্থায় গ্রহণ করার চেষ্টা করবে। তাতে বেদই মিথ্যা হোক, আর শাস্ত্রই মিথ্যা হয়ে যাক। সত্যের চেয়ে এরা বড় নয়। সত্যের তুলনায় এদের মূল্য নেই। জেদের বশে হোক, মমতার বশে হোক, সুদীর্ঘ দিনের সংস্কারে হোক, চোখ বুজে অসত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করায় বিন্দুমাত্র পৌরুষ নেই।" এই বইতে আর এক জায়গায় বলছেন, "কোনও ধর্মগ্রন্থই অভ্রান্ত সত্য হতে পারে না। বেদও ধর্মগ্রন্থ, সুতরাং এতেও মিথ্যার অভাব নেই।" শ্লেষ করে বলছেন, "একদিকে তোমরা বলছ, ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ, অচিন্ত্যনীয়, আবার তাকে নিয়েই এমন আলোচনা করছ, যেন এইমাত্র স্বচক্ষে দেখে এলে!" এইভাবে আলোচনা করে বলছেন, "যা বুদ্ধির বাইরে তা বুদ্ধির বাইরে বলেই ত্যাগ করবো। মুখে বলবো অব্যক্ত, অবোধ্য, অজ্ঞেয়, আর কাজে কথায় তাকেই ক্রমাগত বলবার চেষ্টা, জানবার চেষ্টা কিছুতেই করবো না।" ব্রহ্ম নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের সম্পর্কে তাঁর এই বক্তব্য। ছাত্র যুবকদের মিটিং-এ বলেছেন, "সত্যের কোনও শাশ্বত সংজ্ঞা আমার জানা নেই। দেশ কাল ও পাত্রের সম্বন্ধ বা relation দিয়ে সত্যের যাচাই হয়। দেশ কাল পাত্রের পরস্পরের সম্বন্ধে সত্য জ্ঞানই সত্যের স্বরূপ। একের পরিবর্তনের সঙ্গে অপরের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তনকে বুদ্ধিপূর্বক মেনে নেওয়াই সত্যকে জানা।"[৩] এ যেন একেবারে Theory of relativity-র ভিত্তিতে কথা। 'শ্রীকান্ত' ৩য় পর্বে বলছেন, "এই সংসারে যাহা কিছু

ভাবিবার বস্তু ছিল সমস্তই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের জন্য বহু পূর্বেই ভাবিয়া স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন। দুনিয়ায় আর নূতন করিয়া চিন্তা করিবার কোথাও কিছু বাকি নাই। তাঁহারা দয়া করিয়া যদি শুধু কেবল আমাদের এই ইংরেজি আমলটার জন্য ভাবিয়া না যাইতেন, তাহলে তাঁহারাও অনেক দুরূহ চিন্তার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিতেন, আমরাও হয়তো সত্য সত্যই আজ বাঁচিতে পারিতাম।" মানে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা আমাদের হয়ে আগ বাড়িয়ে না ভেবে, যদি আমাদের কালটা আমাদের উপর ছেড়ে দিতেন, তাহলে তাঁরাও অনেক দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচতেন, আমরাও অন্তত আমাদের কালটা নিয়ে ভেবে বাঁচতে পারতাম।

সাহিত্য সভার ভাষণে তিনি বলছেন "শতকোটি বর্ষের প্রাচীন পৃথিবী আজও তেমনি বেগেই ধেয়ে চলেছে, মানব মানবীর যাত্রা পথের সীমা আজও তেমনি সুদূরে। তার শেষ পরিণতি তেমনি অনিশ্চিত, তেমনি অজানা। শুধুই কি কেবল তার কর্তব্য ও চিন্তার ধারাই চিরদিনের মতো শেষ হয়ে গেছে? বিচিত্র ও নব নব অবস্থার মাঝ দিয়ে তাকে অহর্নিশি যেতে হবে — তার কত রকমের সুখ, কত রকমের আশা আকাঙ্ক্ষা, থামবার জো নেই, চলতেই হবে — শুধু কি তার নিজের চলার উপর কোন কর্তৃত্ব থাকবে না? কোন সুদূর অতীতে তাকে সে অধিকার থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করা হয়ে গেছে! যাঁরা বিগত, যাঁরা সুখ দুঃখের বাইরে, এ দুনিয়ার দেনা পাওনা শোধ দিয়ে যাঁরা লোকান্তরে গেছেন, তাঁদের ইচ্ছা, তাঁদেরই চিন্তা, তাঁদের নির্দিষ্ট পথের সংকেতই কি এত বড়? আর যাঁরা জীবিত, ব্যথায় বেদনায় হৃদয় যাঁদের জর্জরিত, তাঁদের আশা, তাঁদের কামনা কি কিছুই নয়? মৃতের ইচ্ছাই কি চিরদিন জীবিতের পথ রোধ করে দাঁড়াবে?"[৪] শাশ্বত ও সনাতন আদর্শের তত্ত্বের বিরুদ্ধে এই বক্তব্য এতটাই স্বচ্ছ যে, আর কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে না। আর একটা ছোট্ট লেখায় বলেছেন "দেশকে স্বাধীন করার প্রয়াস 'ন্যারো ন্যাশানালিজম নয়', 'চাউভিনিজম'- ও নয়, বিশ্ব মানবের হিত সাধনের জন্যই নিজের দেশ। আদর্শের উল্লেখ যখন করবো, তখনই বৃহৎ আদর্শ, কল্যাণের আদর্শ, গৌরবের আদর্শের কথাই স্মরণ করবো। কেবল মহা মানবের আদর্শ গ্রহণ করব, তাকে ভারতের আদর্শ, এশিয়ার আদর্শ, হিন্দুর আদর্শ এদিক দিয়ে কিছুতেই বিচার করব না। কারণ সেইতো ক্ষুদ্র মনের সংকীর্ণ হীন আদর্শ, কোন মতেই সর্বজনীন মুক্ত আদর্শ নয়।"[৫] রাজনৈতিক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ভগবানের ইচ্ছার দোহাই দেওয়ার সমালোচনা করে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড়ো ঈশ্বর বিশ্বাসী জগতে কেউ আছেন বলে মনে হয়না। এই পরম ভাগবত কবির সহস্র পলিটিক্যাল যুক্তি তর্ক ভগবানের রুদ্ধ দ্বারে এসে আছড়ে পড়ে। প্রাচীনকালে দর্শনের বড়ো বড়ো যুক্তিতর্ক যেমন বেদের বাণীর দরজায় এসে নিজেদের পথ হারিয়ে আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হতো। তাঁর একান্ত বিশ্বাস বিধাতার কল্যাণহস্তই সবকিছু করে চলেছে। তাঁর ইচ্ছা কি তা আমরা জানি নে, তাঁর ইচ্ছার দোহাই

পলিটিক্সে আসা কোন কারণেই আমার ভালো মনে হয় না।"[৫] এই হচ্ছে যথার্থ সেক্যুলারিজম, রাজনীতিকে ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত করার আহ্বান। একই কারণে গান্ধিজির সমালোচনা করে বলছেন, "বড় বড় ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্তের দলই এযাবৎ দেশের পলিটিক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। যাদের হওয়া উচিৎ ছিল সন্ন্যাসী, তাঁরা হলেন পলিটিসিয়ান। তাই ভারত পলিটিক্সে এতবড় দুর্গতি।" দেখুন সেই যুগেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সম্পর্কে কি উদ্বেগ শরৎচন্দ্র প্রকাশ করেছিলেন। যাঁরা বলতেন, এদেশের সনাতন আদর্শের পথেই চলতে হবে, বিদেশ থেকে কোনও আদর্শ সঠিক হলেও তা নেওয়া চলবে না, তাঁদের বিরুদ্ধতা করে তিনি বলেছেন, "Idea পশ্চিমের কি উত্তরের ইহা বড় কথা নয়। স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়। বড় কথা ইহা দেশ ও জাতির কল্যাণের কিনা।"[৬]

একইভাবে তিনি 'শ্রীকান্তে'র চতুর্থ পর্বে দেখালেন, 'বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা হল সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' বা বিবেকানন্দের বাণী 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' — কিন্তু ধর্মের এই শিক্ষাগুলি আজ প্রাণহীন অন্তঃসারশূন্য হয়ে গেছে। মুরারিপুকুরের বৈষ্ণব মঠ, দ্বারিকা দাস বাবাজি সেখানকার অধ্যক্ষ, বেশ কিছু বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী থাকে। কমললতাই সেখানকার মূল দায়িত্বে, সেবায়, যত্নে, কর্মকুশলতায় সেখানকার প্রাণ। সবাই তাকে ভালোবাসে। একজন সৎ, ধর্মপরায়ণ মুসলমান, রামায়ণ অবলম্বনে কবিতা লেখে, মঠ ও মসজিদের জন্য সম্পত্তি দান করে, সেই কবি গহর যখন রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শয্যায় পড়ে আছে, কমললতা তাকে সেবা করার জন্য ছুটে যায়। কিন্তু তার এই 'অপরাধের' জন্য দ্বারিকা দাসেরও যাঁরা গুরু, তাঁরা নির্দেশ দিলেন কমললতাকে আশ্রম থেকে বহিষ্কার করতে হবে। কারণ তাঁর চরিত্র ঠিক নেই। বিস্মিত শ্রীকান্ত দ্বারিকা দাসকে প্রশ্ন করল, 'তুমিও কি এটা বিশ্বাস কর'? দ্বারিকা দাস জবাব দিলেন, 'না'। শ্রীকান্ত জানতে চাইল, কমললতাকে তা হলে চলে যেতে হল কেন? তুমিই তো মঠের অধ্যক্ষ! নিরুপায় দ্বারিকা দাস জবাব দিলেন, গুরু! গুরু! গুরু! অর্থাৎ গুরুর নির্দেশ মিথ্যা হলেও অমান্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তারপর দ্বারিকা দাস বললেন, নির্দোষকে সাজা দিয়ে আমিও এ মঠে আর থাকব না। এক বস্ত্রে কমললতা যখন মঠ ত্যাগ করছে, তখনও খোল করতাল সহযোগে ভগবানের আরাধনা সঙ্গীত চলছে, চলছে সর্ব জীবের প্রতি প্রেমের আহ্বান। এই হচ্ছে ধর্মের পরিণতি! অনুষ্ঠান আছে, কিন্তু প্রাণ নেই। গ্রামাঞ্চলেও সে ধর্ম মৃত শবদেহ মাত্র, এটা দেখিয়ে শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজের' রমেশের মধ্যে প্রশ্ন জাগিয়ে বলছেন, "কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম আমাদের এই সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে? ধর্মের প্রাণটাই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ, তাহার মৃতদেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন? এই বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্য সমাজ যে যথার্থ ধর্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া তাহারই বিষাক্ত পুতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায় অহর্নিশে অধঃপথেই নামিয়া চলিতেছে।" শরৎচন্দ্রের সময় একথা যত সত্য ছিল, আজ তার

তুলনায় বহু সহস্র গুণ সত্য, এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনারা আমার সাথে একমত হবেন।

আবার হাস্যরসের মাধ্যমেও তিনি ধর্মীয় চিন্তাকে আঘাত করলেন। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে প্রশ্ন করছে, পরজন্মেও আমরা পরস্পরকে পাব তো? কারণ হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্মজন্মান্তরের। শ্রীকান্ত উত্তর দিচ্ছে, তা কী করে সম্ভব! আমি হয়তো কর্মফলে পরজন্মে গরু হয়ে জন্মাব, আর তুমি হয়তো বামুনের মেয়ে হয়ে জন্মাবে। আর একটি আলোচনায় রাজলক্ষ্মী পরম বিশ্বাসে বললেন, বৈদিক মন্ত্রের জোরে হিন্দুদের বিয়ের বন্ধন অক্ষয় হয়ে থাকে। শ্রীকান্ত আপত্তি জানিয়ে বলল, বৈদিক মন্ত্রের জোরে নয়, মন্ত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের জোরে টিঁকে থাকে। এ নিয়ে দু'জনের তর্ক হচ্ছিল। এ সময়ে পাশে ডোম পাড়ার একটি বিয়ে নিয়ে তুমুল গণ্ডগোল বেধে যায়, বরপক্ষ এবং কনেপক্ষের মধ্যে। তারা রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তকে টেনে নিয়ে যায় মীমাংসা করানোর জন্য। বরপক্ষের পুরোহিত অভিযোগ করে যে, কনে পক্ষের পুরোহিত ভুল মন্ত্র পড়াচ্ছে। কারণ কনে পক্ষের পুরোহিত মন্ত্র পড়াচ্ছে 'মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ, ভগবতি ডোমায় পুত্রায় নমঃ।' বর পক্ষের পুরোহিত বজ্র কণ্ঠে জানাল, এ বিয়েই হল না, ভুল মন্ত্র পড়িয়েছে। বাকি সকলে ওর আপত্তি মেনে ওকেই অনুরোধ করল আসল মন্ত্র পড়াতে। তখন সে জানাল, এ অঞ্চলে সে ছাড়া আসল মন্ত্র কেউ জানে না। তারপর সেই আসল মন্ত্র পড়াল 'মধু ডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রাং নমঃ, ভগবতি ডোমায় পুত্রায় সম্প্রদানং নমঃ'। এই 'আসল' মন্ত্রের জোরে শেষপর্যন্ত বিয়ে শুদ্ধ হল! শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী কোনও রকমে হাসি চেপে সবটা লক্ষ করল। পরে ফিরে এসে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে বলল, মন্ত্রগুলো ঠিক ঋষিরুবাচ বলে মনে হল না! কিন্তু তবু তো এদের কোনও মন্ত্রই বিফল হয়নি। এমনি করেই তো এদের মেয়ের মা-র এবং মেয়ের ঠাকুরমার বিবাহ হয়েছিল। এদের দেওয়া বিবাহ বন্ধন আজও তেমনি দৃঢ় তেমনি অটুট আছে। মন্ত্রের জোরে নয়, অন্ধ বিশ্বাসের জোরে।

আবার অন্যদিকে সাহিত্য, শিল্প শাশ্বত, সনাতন হয়ে থাকবে, এটা তিনি বিশ্বাস করতেন না। এই বিষয়েও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর পার্থক্য ঘটে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেছেন, 'আজি হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি পড়িছ বসি, আমার কবিতাখানি'! সেখানে শরৎচন্দ্র বলছেন, "যে কাল আজও আসেনি, সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার লেখার মূল্য থাকবে কি থাকবে না, সে আমার চিন্তার অতীত। আমার বর্তমানের সত্যোপলব্ধি, যদি ভবিষ্যতের সত্যোপলব্ধির সাথে এক হয়ে মিলতে না পারে, পথ তাকে তো ছাড়তেই হবে। তার আয়ুষ্কাল যদি শেষ হয়েই যায়, সে শুধু এই জন্যই যাবে যে, আরও বৃহৎ, আরও সুন্দর, আরও পরিপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টি কার্যে তার কঙ্কালের প্রয়োজন আছে। ক্ষোভ না করে, বরঞ্চ এই প্রার্থনাই জানাব যে, আমার দেশে আমার ভাষায় এতবড় সাহিত্যই জন্ম লাভ করুক যার তুলনায় আমার লেখা যেন একদিন অকিঞ্চিৎকর হয়েই যেতে পারে।"[৭]

‘গৃহদাহ’ নামে শরৎচন্দ্রের একটা উপন্যাস আছে। সে উপন্যাস নিয়েও একটু বলব, সেখানে একটা দর্শন তত্ত্বের কথা আছে সেটাও বলব। আমি গৃহদাহের বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে যাব না। এই উপন্যাসে আধুনিক নারী জীবনের সমস্যার কথা আছে। শরৎচন্দ্র আধুনিকতার পক্ষে ছিলেন। নারী স্বাধীনতা এবং নারী শিক্ষার পক্ষেও ছিলেন। কিন্তু অত্যাধুনিকতার নামে একটা উগ্রতার ঝোঁক আসছিল সেটাও তিনি লক্ষ করেছিলেন। সে সম্পর্কেও তিনি সতর্কবাণী দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, এদেশে যথার্থভাবে নবজাগরণ না হওয়ায় গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা এসব কথাগুলো শুধু কথা হিসাবেই এসেছে, কিন্তু সত্যিকারের গণতান্ত্রিক মনন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে আসেনি। মূল্যবোধহীন তথাকথিত আধুনিকতার তুলনায় পুরনো ধর্মীয় মূল্যবোধের মধ্যে বরং এখনও কিছু প্রাণ আছে। ‘গৃহদাহ’-এর নায়িকা অচলা কলকাতার শিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে, গরিব ঘরের মহিমকে সে ভালোবেসেছে। মহিমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুরেশও অচলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এই বইয়ের বিস্তৃত ঘাত-প্রতিঘাতের কাহিনীর মধ্যে আমি যাব না। কিন্তু অচলা শেষ পর্যন্ত মহিমকেই গ্রহণ করেছে। সুরেশের মধ্যে অচলা সম্পর্কে যে আকর্ষণ ছিল, অচলা তা জানতো। শরৎবাবু দেখাচ্ছেন, মহিমকে বিয়ে করার পরেও সুরেশের তার প্রতি যে আকর্ষণ সেটা অচলা যুক্তিতে সমর্থন করে না, ঘৃণা করে, কিন্তু তা সত্বেও অচলা যখন দেখে সুরেশ এই দুর্বলতা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে, তার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছে, তখন আবার, অচলা দুঃখ পায়, ব্যথা পায়। অর্থাৎ সে স্বামীকে গ্রহণ করেছে, অন্য পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এটা যুক্তি দিয়ে সমর্থন করে না, কিন্তু সুরেশ যখন তার প্রতি আকর্ষণ মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে তখন অচলা ব্যথাও পায়। একদিকে সমর্থন করে না, অন্যদিকে আরেক মন চায়, এই আকর্ষণ enjoy করতে। এটা এক অদ্ভূত সাইকোলজিক্যাল দ্বন্দ্ব। আধুনিক জীবনে নরনারীর অবাধ মেলামেশার মধ্যে রুচি সংস্কৃতির সীমা না থাকলে যে problem সৃষ্টি হয় ‘গৃহদাহ’-তে এটাই শরৎবাবু দেখিয়েছেন। এটা আধুনিককালের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। অথচ শরৎবাবু নরনারীর অবাধ ও স্বাধীন মেলামেশার পক্ষেই ছিলেন, অবশ্যই রুচি-সংস্কৃতির সীমা মেনে।

অচলার এই দ্বন্দ্বের ফলে সুরেশের ধারণা হল আসলে অচলা আমাকেই চায়, কিন্তু মহিমের জন্য গ্রহণ করতে পারছে না। সুরেশ মহিমকেও ভালোবাসত। সুরেশ মনে করত, মহিম বলিষ্ঠ, সাহসী আর আমি দুর্বল। অচলাকে হারাবার আঘাত মহিম সহ্য করতে পারবে, কিন্তু আমি পারব না। অচলা রুগ্ন মহিমের স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তাকে নিয়ে বাংলার বাইরে যাচ্ছে। অচলা দেখল সুরেশের চেহারা শুকিয়ে যাচ্ছে, এ অবস্থায় সে হঠাৎ সুরেশকে বলে বসল ‘তুমিও চল’। এখান থেকেই বিপদ এল। এর পরের ঘটনা ট্রেন যেখানে চেঞ্জ করার কথা সেখানে সুরেশ ঘুমন্ত মহিমকে ঐ ট্রেনেই রেখে অচলাকে ভুল বুঝিয়ে তাকে নিয়ে নেমে গেল। মহিম যে ঐ ট্রেনেই থেকে গেল, অচলা বুঝতেই পারেনি। যখন বুঝতে পারল অচলা পাগলের মতো

ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। এই জিনিস সে চায়নি, ভাবেওনি। প্রথমে সে ভেবেছে মহিমকে হয়তো সুরেশ হত্যা করেছে। ফলে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। সুরেশও ক্ষিপ্ত হয়ে পাল্টা অচলাকে অভিযুক্ত করছে, এর জন্য কে দায়ী? তুমিই তো আমাকে প্রলুব্ধ করেছ! এই হচ্ছে ঘটনা। তারপর শুরু হল আর একটা জীবন। কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে? এক দয়ালু বৃদ্ধ রামবাবু তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। মিথ্যা পরিচয় দিতে হল, সুরেশ-অচলাকে, যে তারা স্বামী-স্ত্রী। স্নেহশীল রামবাবু অচলার রান্না খাবেন, কিন্তু অচলা এড়াবার চেষ্টা করছে, কারণ একদিন জানাজানি হয়ে গেলে এই ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধ প্রবল আঘাত পাবেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বারংবার অনুরোধে রান্না করতে হল। এইভাবে রামবাবুর বাড়িতে থাকা, যেখানে অচলা নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল, সুরেশের সাথে থাকেনি একঘরে। রামবাবু ভেবেছেন এদের মধ্যে কোনও ভুল বোঝাবুঝি আছে, বাড়ির অমতে হয়ত বিয়ে করেছে। রামবাবু অচলাকে মেয়ের মতো ভালোবেসেছেন, ভেবেছেন, এরা আলাদা বাড়িতে নিজেরা থাকলে বোঝাপড়া হয়ে যাবে। ফলে তাদের জন্য একটা আলাদা বাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। রামবাবু ভাবলেন, ওরা এতে সুখেই থাকবে। কিন্তু অচলা নতুন বাড়িতে যেতে চাইছে না। আবার কারণটাও বলতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত রামবাবুর চাপাচাপিতে যেতে বাধ্য হল। যাওয়ার সময় রামবাবু দেখলেন, মেয়েটার মুখ কালো হয়ে আছে, সেইজন্য উদ্বিগ্ন রামবাবু প্রথমদিনই ওদের বাসায় গেলেন। অচলা চাইছে রামবাবুর সাথে গল্প করেই সারা রাত কাটাতে। কিন্তু রামবাবু তা হতে দিলেন না। রাত হয়েছে বলে অচলাকে একরকম জোর করে সুরেশের ঘরে পাঠালেন। অচলা আপত্তি করতে পারল না। ভোর রাতে রামবাবু দেখছেন অচলা তাঁর সামনে বসা, যেন একটা কালো পাথরের মতো, চোখে অঝোরে জল ঝরছে। কারণ সে নিজেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারল না। এটা দিয়ে শরৎবাবু দেখালেন, উদার ব্রাহ্মধর্মের আধুনিক শিক্ষায় লালিত পালিত হয়েও অচলারা মূল শিক্ষা পায়নি, বাইরের খোলসটাকেই তারা বড়ো করে দেখেছে, অন্তরের ধর্মকে গুরুত্ব দেয়নি। সেও তো সতীত্বকে ধর্ম মনে করে, কিন্তু আধুনিকতায় পালিত হয়ে সেটাকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারল না। শরৎবাবু বললেন, “তাহাদের আজন্ম শিক্ষা ও সংস্কার ভিতরটাকে তুচ্ছ করিয়া, কারাগার ভাবিয়া বাহিরের জগৎটাকেই চিরদিন সকলের উপর স্থান দিয়াছে। .... সেই অন্তরের অব্যক্ত ধর্ম কোনদিন তাহার কাছে সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই বাহিরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সেদিনও সে ভদ্রমহিলার সম্ভ্রমের বহির্বাসটাই আঁকড়াইয়া ধরিল, এই আচরণের মোহ কাটাইয়া আপনাকে নগ্ন করিয়া কিছুতেই বলিতে পারিল না, জ্যাঠামশাই, আমার পর্বতপ্রমাণ মিথ্যার পরে আজ আমাকে সত্য বলিয়া জগতে কেহই বিশ্বাস করিবে না। জানি, কাল তুমি ঘৃণায় আর আমার মুখ দেখিবে না.... সেই সমস্তই সহিবে, কিন্তু তোমার আজিকার এই ভয়ঙ্কর স্নেহ আমায় সহিবে না।” ফলে সম্ভ্রমের বহির্বাসটাকেই লজ্জায় সে আঁকড়ে

ধরে থাকল, রামবাবু যখন সুরেশের ঘরে শুতে যাবার জন্য জোরাজুরি করছিলেন, তখন বলতে পারল না, আমরা স্বামী-স্ত্রী নই। একথা বললে রামবাবু তাকে ঘৃণায় পরিত্যাগ করতেন কিন্তু যে সতীত্বকে সে মূল্যবান মনে করে, সেটা নষ্ট হত না। শরৎচন্দ্র সৃষ্ট এই সমস্যা শুধু সে সময়ের নয়, এই সমস্যা আধুনিককালেরও। নরনারীর খোলামেলা মেলামেশার মধ্যে রুচি সংস্কৃতির উচ্চমান যদি না থাকে, যা জীবনে চাই না, যাকে চাই না, তাকে কেন্দ্র করে এমন কত দুর্ঘটনা ঘটে যায়, যদি যথার্থ সম্ভ্রমের পরিবর্তে বাহ্যিক সম্ভ্রমকে বড় করে দেখা হয়। দেখালেন বিপদটাও এল বন্ধুর ছদ্মবেশে, রামবাবুর স্নেহ ভালোবাসা রূপে, যাকে অস্বীকার করতে পারল না। সত্য স্বীকার করলে রামবাবু কী মনে করবেন, এটাই বড় হয়ে গেল, ফলে ইচ্ছার প্রবল বিরুদ্ধতা সত্বেও বিপদে ঝাঁপ দিল। আরেকটা মূল্যবান শিক্ষাও শরৎবাবু দেখালেন, যেখানে সুরেশ বলছে, এতদিন ভাবতাম দেহ পেলেই মন পাব, আর এখন দেখছি মনহীন দেহ একটা দুর্বিষহ বোঝা। অর্থাৎ তিনি দেখালেন, যারা মনে করে দৈহিক সম্পর্ক এলেই মন পাওয়া যায়, তারা কত ভ্রান্ত, আর মন বা ভালোবাসা না থাকলে দৈহিক সম্পর্কও দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়ায়। আরেকটা বিষয়ও শরৎবাবু দেখালেন, অচলার যে সৌন্দর্য সুরেশকে আকৃষ্ট করেছিল, সে রূপ আর নেই। কারণ তিনি দেখালেন, সকালবেলায় পাতার উপর যে শিশির বিন্দু সূর্য কিরণে ঝলমল করে, কেউ লোভ করে সেই শিশির বিন্দু হাতে তুলে নিলে সেই সৌন্দর্য আর থাকে না। তেমনি মহিম-অচলার ভালোবাসার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে অচলার যে সৌন্দর্য দেখা গিয়েছিল, লোভের বশবর্তী হয়ে, বিভ্রান্ত করে সুরেশ তাকে বিপথে এনে সেই রূপকেই নষ্ট করে দিল। শেষপর্যন্ত সুরেশ প্লেগ রোগীর সেবা করতে গিয়ে মারা যায়, মৃত্যুর আগে গভীর অনুতাপে বন্ধু মহিমকে বলে যায়, অচলা যে তোমাকে এত ভালোবাসত তা আমি আগে বুঝতে পারিনি। ওকে না আমি পেলাম, না তোমাকে পেতে দিলাম। লোভে সুন্দর জিনিসটাই নষ্ট করে দিলাম। মৃত্যুর সময় অচলা সেখানে গেছে। রামবাবুও গেছেন অচলাকে সান্ত্বনা দিতে। তাঁর স্বাভাবিক ধারণা অচলা সৎকার করবে স্ত্রী হিসাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অচলা দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে সেখানে বলল, আমি তার স্ত্রী নই। এই অভাবনীয় স্বীকারোক্তিতে রামবাবু প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। কোনওক্রমে শবদাহের পর অচলাকে সেই শ্মশানের মধ্যে ফেলে রেখে রামবাবু পাগলের মতো ছুটলেন কাশীতে। কারণ এই ঘোর পাপিষ্ঠার জন্য তাঁর ধর্ম চলে গেল। এইখানেই শরৎচন্দ্র বলছেন, “যে ধর্ম অত্যাচারের আঘাত থেকে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করিতে পারে না, বরঞ্চ তাহাকে মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে সমস্ত শক্তি অহরহ উদ্যত রাখিতে হয়, সে কিসের ধর্ম! মানব জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা কোনখানে! যে ধর্ম স্নেহের মর্যাদা রাখিতে দিল না, নিঃসহায় নারীকেও মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া পলাইতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করিল না, আঘাত পাইয়া যে ধর্ম এতবড় স্নেহশীল বৃদ্ধকেও এমন চঞ্চল প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া দিল, সে কিসের ধর্ম! ইহাকে যে স্বীকার করিয়াছে

সে কোন সত্য বস্তু বহন করিতেছে”? এই ঘটনার background-এ শরৎচন্দ্র এই প্রশ্নই তুলে ধরলেন। এইভাবে শরৎচন্দ্র নানা কাহিনী ও ঘটনার মধ্য দিয়ে পুরাতন ধর্মীয় চিন্তা, মানসিকতা, ঐতিহ্যকে আঘাত করলেন। আবার শরৎচন্দ্র দেখালেন, যেহেতু আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনই সেভাবে হয়নি, তাই পুরনো ধর্মীয় মূল্যবোধটুকু তখনও কিছু প্রাণ বহন করছে। দেখালেন আধুনিক শিক্ষিত মহিম সুরেশের মুখে মহিমের প্রতি অচলার গভীর ভালোবাসার কথা জেনেও সুরেশের সাথে তার চলে আসা ও একত্রে থাকার জন্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে অচলাকে স্থান দিতে পারল না, অবশেষে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন মৃণালই অচলাকে আশ্রয়ের সন্ধান দিতে এগিয়ে গেল।

আধুনিক শিক্ষিত সমাজে যে বাহ্যিক বিলাসিতা সাজগোজ ভোগের আতিশয্য এসেছে, কিন্তু দায়িত্ববোধ কর্তব্যবোধ আসেনি, যেটা এখনও পৌরাণিক গ্রাম্য অশিক্ষিতদের মধ্যেই রয়েছে — একটা ছোট্ট গল্প ‘অনুরাধা’তে শরৎবাবু এই বিষয় দেখালেন অন্যভাবে। সেখানে কাহিনীটা এরকম। গ্রামে জমিদারি নিলাম হয়ে গেছে, জমিদারেরই এক প্রজা কলকাতায় ব্যবসা করছে, সে তা কিনে নিয়েছে। আগের জমিদারের পুত্র গগন এখন নায়েব। সে আদায় হওয়া কোনও খাজনা জমিদারকে না দিয়ে কোথাও পালিয়ে গেছে। তার অবিবাহিতা বয়স্কা বোন অনুরাধা আর এক বোনের কিশোর পুত্রকে নিয়ে সেই জমিদার বাড়িতেই একটা ভাঙাচোরা ঘরে থেকে মানুষ করছে। যে এখন মালিক তার ছোট ছেলে বিজয় কলকাতা থেকে তার মা মরা কিশোর পুত্রকে নিয়ে গ্রামে এসেছে। উদ্দেশ্য গগনকে খুঁজে বের করবে এবং অনুরাধাদের উৎখাত করে বাড়ির দখল নেবে। মূল কাহিনীর মধ্যে আমি ঢুকছি না। ওই যে মাতৃহীন কিশোর ছেলেটি এল কলকাতা থেকে বাবার সাথে, অনুরাধা তাকে বোনপোর মতোই গভীর অপত্য স্নেহে দেখাশুনা করছে। যখন বিজয়ের কলকাতায় ফিরে যাবার সময় হল, তার ছেলেটি কিন্তু যেতে চাইছে না, অনুরাধাকে সে আঁকড়ে ধরেছে। বিস্মিত অনুরাধা যখন বিজয়কে প্রশ্ন করে, এই শিশুটি কেন কলকাতার বাড়িতে যেতে চাইছে না? সে উত্তর দিচ্ছে, সম্ভবত এখানে যে জিনিসটা পেয়েছে, সেই স্নেহ ভালোবাসা কলকাতায় গেলে পাবে না। ছোট তো, এ কথা গুছিয়ে বলার ভাষা তার নেই, কিন্তু নাড় দিয়ে শিশুটি তা বুঝেছে। অনুরাধা প্রশ্ন করছে, শুনেছি শীঘ্রই তার বিমাতা আসবেন, তিনি নাকি বি এ পাশ। বিজয় উত্তর করছে, তার জ্যাঠাইমাও তো বি এ পাশ করা। কিন্তু বি এ কোর্সের সিলেবাসের মধ্যে সতীনের ছেলেকে বা পরের ছেলেকে দেখার সাবজেক্ট নেই। অনুরাধা প্রশ্ন করল, বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা যত্ন করা? বিজয় জবাব দিল, সে তো আরও চিন্তার বাইরে। অনুরাধা উদ্বিগ্ন হয়ে বলছে এরকম মায়ের হাতে নাই বা সন্তানকে তুলে দিলেন। বিজয় বলল, আমি তুলে দিলেও কিছু হবে না, তুলে দিতে গেলেই খসে পড়ে যাবে। যখন অনুরাধা বলছে, এরকম নিষ্ঠুর বিমাতার হাতে আপনি ছেলেকে নাই বা দিলেন? বিজয় উত্তর দিল, আমার ভাবী পত্নীর হয়ে আমি

প্রতিবাদ করছি। আমাদের সমাজে বি এ পাশ স্ত্রী না হলে মনও ভরে না, ঘরও চলে না, মানও থাকে না। অনুরাধা বলল, "একজন নির্দয় বিমাতার হাতে তুলে দিতে ওকে আপনি পারবেন না।" বিজয় জবাব দিল, "সে ভয় নেই, কারণ, তুলে দিলেও হাত থেকে আপনি গড়িয়ে নীচে পড়বে। .... কিন্তু তাই বলে তিনি নির্দয়ও নয়, এবং আমার ভাবী পত্নীর স্বপক্ষে আপনার কথার আমি তীব্র প্রতিবাদ করি। তাদের মার্জিত রুচিসম্মত উদাস অবহেলায় নেতিয়ে-পড়া আত্মীয়তার লেশ নেই। ও দোষটা দেবেন না।" শরৎচন্দ্র বোঝাতে চেয়েছেন, যেমন গাছ আছে কিন্তু শেকড় নেই, শহরের ধনী শিক্ষিত পরিবারে পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক তাই। পাতা সবুজ হতে না হতেই হলদে হয়ে যায়। এই হচ্ছে তাদের জীবন। ফলে বলছেন, বি এ কোর্সের মধ্যে সতীনের ছেলেকে দেখার সাবজেক্ট নেই। অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষা এসেছে, কিন্তু যথার্থ কালচার, যথার্থ আধুনিকতা আসেনি। এই একই প্রশ্ন যেটা অন্যভাবে 'গৃহদাহ'তে তুলেছেন শরৎবাবু। কারণ যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও আধুনিক শিক্ষা মানুষকে স্বার্থপরতামুক্ত, পরোপকারী করে তোলে, উদারতা, এথিক্যাল মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব আনে, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও কর্তব্যবোধ জাগায়, সেই গণতান্ত্রিক বিপ্লব এদেশে হয়নি, যথার্থ আধুনিক শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আসেনি। অথচ শরৎবাবু নারীশিক্ষার পক্ষের লোক ছিলেন, নারীজাগৃতির পক্ষের লোক ছিলেন। দেখিয়ে দিলেন পুরাতন মূল্যবোধ সম্পন্ন গ্রামীণ অতি স্বল্প শিক্ষিত নারী পরের ছেলেকে মাতৃস্নেহে যেভাবে বুকে তুলে নিতে পারে, শহরের বি এ পাশ করা বিমাতা তা পারে না। কারণ শহুরে আধুনিক শিক্ষিত জীবনে বাহ্যিক আদবকায়দা আছে, ঠাটবাট আছে, নেই যথার্থ মমতা, অপত্য স্নেহ, কর্তব্যবোধ। শরৎচন্দ্র সে যুগে এই সংকট যা দেখিয়েছেন, এখন তা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের দিনে বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাবে উপার্জনশীল শিক্ষিত ছেলেরা একদিকে গাড়ি-বাড়ি করছে, দেশ-বিদেশে বেড়াচ্ছে, হোটেলে ফূর্তি করছে, অন্যদিকে বৃদ্ধ অসহায় বাবা-মাকে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে, না হলে বড়জোর ঝামেলা এড়াবার জন্য 'বৃদ্ধাশ্রমে' পাঠিয়ে দিচ্ছে। ধনী পরিবারে এমনও হচ্ছে, কিছু মা সতীনের ছেলে কেন, নিজের সন্তানের দায়িত্বও নিতে চাইছে না। টাকা দিয়ে আয়া রেখে দিচ্ছে, আর নিজেরা দু'বেলা ছুটছে ফূর্তির সন্ধানে।

একটা প্রশ্ন আমার কাছে এসেছে যে, বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ দিয়ে গেছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে বিধবা বিবাহ দেননি, কেন? আগে শরৎবাবুর একটা বক্তৃতা থেকে পড়ি, তারপর আমি এ সম্পর্কে বলব। "বিধবা বিবাহ মন্দ হিন্দুর ইহা মজ্জাগত সংস্কার। গল্প উপন্যাসের মধ্যে বিধবা নায়িকার পুনর্বিবাহ দিয়া কোন সাহিত্যিকেরই সাধ্য নেই নিষ্ঠাবান হিন্দুর চোখে সৌন্দর্য সৃষ্টি করবার। পড়বামাত্র মন তার তিক্ত বিষাক্ত হয়ে উঠবে। গ্রন্থের অন্যান্য সব গুণই তার কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গভর্নমেন্টের সাহায্যে বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তখন শাস্ত্রের বিচার করেছিলেন, হিন্দুর মনের বিচার করেননি।

তাই আইন পাশ হল বটে কিন্তু হিন্দু সমাজ তাকে গ্রহণ করতে পারল না। তাঁর অতবড় মহান চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল। নিন্দা, গ্লানি, নির্যাতন তাঁকে অনেক সইতে হয়েছে। কিন্তু তখনকার কোন সাহিত্যসেবী সেদিন তাঁর পক্ষ অবলম্বন করলেন না।"[৪] এটা note করবেন। এ অভিযোগ তাঁর বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও। তারপর বলছেন, "হয়তো এই অভিনব ভাবের সঙ্গে তাঁদের সত্যই সহানুভূতি ছিল না। হয়তো তাঁদের সামাজিক অপ্রিয়তার অত্যন্ত ভয় ছিল। যে জন্যই হোক সেদিনের সেই ভাবধারা সেখানেই রুদ্ধ হয়ে রইল। সমাজদেহের স্তরে স্তরে গৃহস্থের অন্তঃপুরে সঞ্চারিত হতে পেল না। কিন্তু এমন যদি না হত, এমন উদাসীন হয়ে যদি তাঁরা না থাকতেন, নিন্দা গ্লানি নির্যাতন সকলই তাঁদেরকে সইতে হত সত্য, কিন্তু আজ হয়তো আমরা হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার আর একটা অন্য চেহারা দেখতে পেতাম। সেদিনের হিন্দুর চোখে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি কদর্য, নিষ্ঠুর ও মিথ্যা প্রতিভাত হত, আজ অর্ধশতাব্দী পরে তাই দেখে হয়তো আমাদের নয়ন ও মন মুগ্ধ হয়ে যেত। এমনিই তো হয়। সাহিত্য সাধনায় নবীন সাহিত্যিকের এই তো সবচেয়ে বড়ো সান্ত্বনা। সে জানে আজকে লাঞ্ছনাটাই তার জীবনে একমাত্র এবং সবটুকু নয়। অনাগতের মধ্যে তারও দিন আছে। হোক সে শতবর্ষ পরে। কিন্তু সেদিনের ব্যাকুল ব্যথিত নর নারী শতলক্ষ হাত বাড়িয়ে আজকের দেওয়া সমস্ত কালি মুছে দেবে।"[৪] ফলে সাহিত্যে তাঁর পূর্বসূরীরা যে কাজ করেন নি, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার অন্যতম লক্ষ হচ্ছে বিদ্যাসাগরের আদর্শ এবং স্বপ্নকে যাতে সমাজ গ্রহণ করে, সেই মানসিকতা তৈরি করা। সেই কাজটা যে কত কঠিন শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহ' উপন্যাসে মৃণাল চরিত্র দিয়ে দেখালেন। সেখানে মৃণাল অচলাকে বলছে, "বিয়ে জিনিসটি তোমার কাছে শুধু একটা সামাজিক বিধান।... কিন্তু আমাদের কাছে এ ধর্ম। তাকে আর আমরা বদলাতে পারিনে।... বিধবা বিবাহের আইন যারা পাশ করেছে, তারা ত আমাদের মত নেয়নি। তাঁরা ভেবেছেন, আইন হলেই আমরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যাব, বিয়ের জন্য।" শরৎবাবু দেখালেন, প্রাচীনপ্রথা ধর্মীয় সংস্কাররূপে রক্ত-মাংস মজ্জায় মিশে আছে। ফলে প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। এই জায়গাটায় আঘাত দেওয়ার জন্য শরৎচন্দ্র 'পল্লী সমাজ' বইটি লিখেছেন। রমা-রমেশের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা অত্যন্ত সূক্ষ্ম শিল্প-শৈলীর মাধ্যমে তিনি এনেছেন। রমার রমেশের প্রতি যে অব্যক্ত, চাপা আবেগ তা সে কখনও ব্যক্ত করেনি। শুধু দু'বার রমেশের কাছে এসেছে অন্য ব্যাপারে কিছু বলবার জন্য এই পর্যন্ত। রমেশ শুধু একবার মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে রমাকে তার আবেগ ব্যক্ত করেছে। সেদিন রমার আচরণে ব্যথা পেয়ে অনুযোগের সুরে রমেশ বলেছিল, ছোটবেলায় শুনেছিলাম আমাদের বিয়ে হবে, তারপরে হয়নি, দুঃখ পেয়েছিলাম। এতদিন বাইরে কাটিয়ে গ্রামে এসে ভেবেছিলাম তোমার ছায়ার তলায় বসে গ্রামের কল্যাণকর কিছু কাজ করে যাব। গ্রামের সেই সংস্কারমূলক কাজ করছিলাম। কিন্তু তুমিই শেষপর্যন্ত আমার বিরোধীদের সাথে যুক্ত হলে। শুনে

রমার বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠল, কিন্তু নিজেকে সংযত রাখল, রমেশকে আর কিছু বলেনি। কিন্তু এর বেশি আর কোথাও দুজনের কেউ কিছু বলেনি। তারকেশ্বরের ঘাটের একটা চিত্র শরৎবাবু এমন করে এঁকেছেন যা পড়লে ব্যথায় বুকে মোচড় দেয় — রমা স্নান করে উঠেছে, দেখে রমেশ ঘাটে দাঁড়িয়ে। রমেশ এসেছে তার আত্মীয়রা আসবে বলে। রমেশ প্রথমে রমাকে চিনতে পারেনি কারণ ছোটবেলায় তাকে দেখেছে, পরে গ্রামে সবসময় ঘোমটা পরা অবস্থায় রমাকে দেখেছে। তাছাড়া তারকেশ্বরে তাকে আশাও করেনি। রমার জিজ্ঞাসার উত্তরে রমেশ বলছে, আমার মামার বাড়ির লোকদের আসার কথা ছিল, কিন্তু তারা আসেনি। রমা প্রশ্ন করল, তাহলে থাকবেন কোথায়? রমেশ বলল, 'এখানে আমার কোন থাকার জায়গা নেই'। রমা রমেশকে একটু অপেক্ষা করতে বলে মন্দিরে গেল পূজো দিতে, তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, "আমার বাড়ীতে চলুন।" রমেশ ইতস্তত করছিল, চিনতে পারেনি, রমা বুঝতে পেরে নিজের পরিচয় দিল। খাওয়া দাওয়ার পর রমেশ পাশের ঘরে বিশ্রাম করছিল, রমা খোঁজ নিতে এল। তখন রমেশ রমাকে বলল, "এইমাত্র আমি একা চুপ করে ভাবছিলুম, আমার সমস্ত জীবনটিকে তুমি এই একটা বেলার মধ্যে আগাগোড়া বদলে দিয়েছ। এমন করে আমাকে কেউ কখনো খেতে বলেনি, এত যত্ন করে আমাকে কেউ কোনদিন খাওয়ায় নি। খাওয়ার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে, আজ তোমার কাছ থেকে এই প্রথম জানলাম রমা।" শরৎবাবু লিখছেন, "কথা শুনিয়া রমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া বারংবার শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ স্থির হইয়া বলিল, 'এ ভুলতে আপনার বেশি দিন লাগবে না। যদিবা একদিন মনেও পড়ে, অতি তুচ্ছ বলেই মনে পড়বে, ... দেশে গিয়ে যে নিন্দে করবেন না, এই আমার ভাগ্য।' রমেশ আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'না রমা, নিন্দেও করব না, সুখ্যাতি করেও বেড়াব না। আজকের দিনটা আমার নিন্দা-সুখ্যাতির বাইরে।' রমা কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া নিজের ঘরে উঠিয়া চলিয়া গেল। সেখানে নির্জন ঘরের মধ্যে তাহার দুই চক্ষু বহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।" নারীর ব্যর্থ নিরুদ্ধ প্রেমের কি বেদনাময় প্রকাশ! এরকম করে করে দরদি পাঠকের মনে শরৎবাবু প্রবল ব্যথা সৃষ্টি করেছেন। পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগিয়েছেন, কেন এদের মিলন হচ্ছে না! আর শরৎবাবু বলছেন, কেন আমি মিলন করাতে পারছি না, ভেবে দেখ। এ বই যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, রমাকে সামনে রেখেই গ্রাম্য ধুরন্ধর শয়তান জোতদার বেণী রমেশকে বার বার আঘাত করেছে। রমাকে মিথ্যে বদনাম ও একঘরে করার ভয় দেখিয়ে রমেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিইয়েছে, যাতে রমেশের কারাদণ্ড হয়। রমা জানত রমেশের হাতে ছুরি ছিল না, সে মারেওনি, মারতে যায়ওনি। কিন্তু কোর্টে বলেছিল, 'হাতে ছুরি আছে কিনা আমি দেখিনি। মেরেছিল কিনা জানি না'। চাপে পড়ে বলতে হয়েছিল, না হলে তাকে বেণী ঘোষাল ও সমাজপতিরা একঘরে করে দেবে, তার

ভাইয়ের উপনয়নে কেউ আসবে না। যা জমিদার-জোতদারদের দাপটে গ্রামে গ্রামে ঘটে। কোর্টে ব্যথিত, বিস্মিত রমেশ শুধু রমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। রমাকে জেরা পর্যন্ত করতে দেয়নি উকিলকে, অভিমানে উপরে আপিল করতেও দেয়নি। তখনকার দিনে জমিদারদের এই ধরনের চাপ ছিল, এখনকার এইরকম জমিদারের ভূমিকা নিয়েছে আজকের দিনের গ্রামের ধনীরা ও সরকারি দলের নেতারা। গ্রামে মানুষকে কোণঠাসা করা, জব্দ করা, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো যা কিছু এইসব প্রভাবশালীরাই করে। এই 'পল্লীসমাজ'-এর সবচেয়ে ধর্মীয় চরিত্র বেণীর মা — রমেশ, রমা তাঁকে জ্যাঠাইমা বলত। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, সৎ ধর্মীয় চরিত্র, ধর্মীয় মূল্যবোধেরই প্রতিনিধি। তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ মরণাপন্ন রমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন, রমার যন্ত্রণা কোথায়। তিনি যাচ্ছেন কাশী, বেণীর মতো ছেলে তাঁর মুখে অগ্নি সংযোগ করবে এটা তিনি চান না। রমার প্রতিকারহীন বেদনা বুঝে সাথে তাকেও নিয়ে যাচ্ছেন। ঐ ধর্মপ্রাণ জ্যাঠাইমাকে দিয়েই রমা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র প্রশ্ন তুললেন, "কেন ভগবান এত রূপ, এত গুণ, এতবড় প্রাণ দিয়ে সংসারে যাকে পাঠালেন, কেনই বা বিনা দোষে সমস্ত দুঃখের বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে তাকে সমাজের বাইরে ফেলে দিলেন? এ কি মঙ্গলময়ের খেলা, নাকি আমাদের সমাজের খেয়ালের অভিপ্রায়। ওরে রমেশ, তার মত দুঃখিনী বুঝি আর পৃথিবীতে নেই।" অর্থপূর্ণ এই প্রশ্নটা কার মধ্য থেকে এল, এল সারাক্ষণ গীতা রামায়ণ মহাভারত পাঠ করা জ্যাঠাইমার মনে। এভাবে তাঁর অত্যন্ত ধার্মিক মনের মধ্যেও প্রশ্ন জাগিয়ে দিলেন, যাতে ঘরে ঘরে পাঠকের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগে, দরদী পাঠক যেন চায় এই রমা-রমেশদের মিলন হোক। নাহলে শরৎবাবুর কি অসুবিধা ছিল, আরও দুটো পরিচ্ছেদ লিখতে? তাঁর কি সমস্যা ছিল, রমা-রমেশের বিয়ে দিতে? অতঃপর রমা বা রমেশ বলতে পারত, কলকাতা চল, এখানে আমাদের স্থান হবে না। তারা বিয়ে করে কলকাতায় একটা বাসা ভাড়া করে থাকতে পারত। কিন্তু শরৎবাবু তো সেটা চাননি। কেন চাননি, তার উত্তর 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রী সতীশকে বলেছে, "সমাজ যে ভালোবাসাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না, কোনও স্বামীর সাধ্য নেই তাকে সে মর্যাদা দিতে পারে।" সমাজ এ ধরনের ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিক— এটা শরৎবাবু চেয়েছেন। তিনি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চেয়েছেন। আর তথাকথিত কমিউনিস্টরা প্রশ্ন তুলেছেন, তিনি সমস্যা দেখিয়েছেন, সমাধান দেখাননি। শরৎবাবু বলছেন, সমাধান তো তোমাদেরই হাতে। তোমরা সমাজ পাল্টাও, দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাও। ওরা সেই দায়িত্ব পালন না করে অভিযোগ করছে, পেটিবুর্জোয়া দোদুল্যমানতা ছিল বলে তিনি মিলন দেখাতে পারেননি। ওরা এমনই কমিউনিস্ট! তাই বামপন্থী আন্দোলনেরও এই দুর্গতি! তারা একবার ভেবেও দেখল না, যে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তে অভয়া রোহিনীর মিলন দেখিয়েছেন, শেষপ্রশ্নে কমলের মতো অসাধারণ বলিষ্ঠ নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে রাজলক্ষ্মীকে দিয়ে শ্রীকান্তকে স্বামীরূপে গ্রহণ করা

দেখিয়েছেন, তিনি কেন রমা-রমেশের মিলন, সাবিত্রী-সতীশের মিলন দেখালেন না? তিনি দেখাননি ইচ্ছে করেই। কারণ তিনি চেয়েছেন এই মিলনের পক্ষে সমাজে প্রশ্ন উঠুক, আকাঙ্ক্ষা জাগুক। তাই তিনি ধর্মপ্রাণ জ্যাঠাইমার মধ্য দিয়ে অপূর্ব দক্ষতায় প্রশ্ন তোলালেন।

'শ্রীকান্ত' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, অন্নদাদিদি একটি অসাধারণ চরিত্র। সতীর দেবতা পতি, স্বামীর ধর্মই স্ত্রীর ধর্ম, এই হল হিন্দু ধর্মের বিধান। অন্নদাদিদির বাবা বিয়ে দিয়েছে যার সাথে, সে ঘর জামাই ছিল। অবৈধ কিছু করতে গিয়ে অন্নদাদিদির বোনকে সে খুন করে পালিয়ে যায়। বহুদিন পরে অন্নদাদিদি তার খোঁজ পেল। সেই পলাতক স্বামী বাপের বাড়ির সামনে একটা সাপুড়ে হিসাবে সাপ খেলাচ্ছে। কেউ চিনতে পারেনি, কিন্তু অন্নদাদিদি চিনল, এই তার স্বামী। তখন সাউজী সাপুড়ে, কিন্তু তাহলেও তো সে স্বামী। আর হিন্দু ধর্মের বিধানে স্বামী যেমনই হোক, সতীর দেবতা পতি। অন্নদাদিদি গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে গেল ঐ সাপুড়ের সাথে। শ্রীকান্তের প্রথমপর্বের ঘটনা। এই বইয়ে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের সম্পর্কের যে অসাধারণ ছবি শরৎচন্দ্র এঁকে গেছেন, আমি তার মধ্যে ঢুকছি না। শরৎবাবু অন্নদাদিদি সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে বলছেন, যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। এই অন্নদাদিদি সম্পর্কে দুই কিশোর ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের কি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা! আবার এদের প্রতি তার প্রগাঢ় স্নেহ শরৎচন্দ্রের লেখনীতে যেভাবে চিহ্নিত হয়েছে, আমি সেই বর্ণনাতেও যাব না। দুঃস্থ অসহায় অন্নদাদিদি স্বামীর মৃত্যুর পর চিঠি লিখে তাঁর জীবন কাহিনী জানিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। তিনি লিখছেন, তোমরা ছোট বলে সব কথা বলা গেল না। ইন্দ্রনাথ মাছ চুরি করে, বিক্রি করে জোর করে অন্নদা দিদিকে মাঝে মাঝে আর্থিক সাহায্য দিত। অন্নদাদিদি তাঁর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে এদের আর জড়াতে চাইছেন না। তাই চিঠি রেখে চলে গেলেন। শ্রীকান্তের দেওয়া টাকাটাও রেখে দিয়ে গেলেন। শরৎচন্দ্র কিশোর শ্রীকান্তকে দিয়ে প্রথম পর্বে অন্নদাদিদি সম্পর্কে গভীর ব্যথায় প্রশ্ন তুলে বললেন, "ভগবান! এ তোমার কেমন বিচার! আমাদের এই সতী সাবিত্রীর দেশে স্বামীর জন্য সহধর্মিনীকে অপরিসীম দুঃখ দিয়া সতীর মাহাত্ম্য তুমি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া সংসারকে দেখাইয়াছ, তাহা জানি।...কিন্তু আমার এমন দিদির ভাগ্যে এতবড় বিড়ম্বনা নির্দেশ করিয়া দিলে কেন? কিসের জন্য এতবড় সতীর কপালে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে নির্বাসিত করিয়া দিলে? কি না তুমি তাঁর নিলে? তাঁর জাতি নিলে, ধর্ম নিলে, — সমাজ, সংসার, সম্ভ্রম সমস্তই নিলে। .... কিন্তু যাঁর আসন সীতা সাবিত্রী সতীর সঙ্গেই, তাঁকে তাঁর বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া? কুলটা বলিয়া, বেশ্যা বলিয়া! ইহাতে তোমারই কি লাভ? সংসারই বা পাইল কি?" এইভাবেই শরৎবাবু মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক 'সতীর দেবতা পতি, পতির ধর্মই সতীর ধর্ম' এই concept-কে প্রবলভাবে কষাঘাত করলেন। আবার 'শেষ প্রশ্নে' কমলকে দিয়ে প্রশ্ন

তোলালেন, "সতীদাহের বাইরের চেহারাটা রাজশাসনে বদলালো, কিন্তু তার ভিতরের দাহ আজও তেমনি জ্বলছে, তেমনি করেই ছাই করে আনছে। এ নিভবে কি দিয়ে?" শরৎচন্দ্র দেখালেন, প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজে আজও নারী সম্পর্কে সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়া করে চলেছে, নারীর মধ্যেও একই মনন কাজ করছে, যেটা হচ্ছে সতীত্বই নারী জীবনের একমাত্র আদর্শ, চরম সার্থকতা, আর অন্য কিছু নয়। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের মানদণ্ড নেই।

অন্যদিকে এই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সৃষ্টি করলেন এক বলিষ্ঠ চরিত্র অভয়াকে। তার স্বামী বর্মায় চাকরি করে, বহুদিন তার খোঁজ নেয় না, টাকাও পাঠায় না, সে নিরাশ্রয়। তাকে ভালোবাসে গ্রামেরই ভদ্র মানুষ রোহিণীবাবু। কিন্তু সেই ভালোবাসাকে সে প্রথমদিকে গ্রহণ করেনি। রোহিনীবাবুকে সাথে নিয়েই অভয়া বর্মায় গেছে স্বামীর খোঁজে। শ্রীকান্তের সাহায্যে স্বামীর ঠিকানা পেয়েছে, জানল দুর্নীতিগ্রস্ত স্বামীর চাকরি চলে গেছে শ্রীকান্তের অফিস থেকেই। অভয়াকে ঘরে ফিরিয়ে নেবে এই শর্তে শ্রীকান্ত আবার তাকে চাকরিতে বহাল করে দিল। অভয়া স্বামীর ঘরে ফিরে গেল। পরে একদিন রোহিনীবাবুর খোঁজ নিতে এসে আচমকা শ্রীকান্ত দেখে অভয়া ফিরে এসেছে। রোহিনীর বাড়িতে তখন অভয়াকে সে প্রত্যাশা করেনি। অভয়াও এসে শ্রীকান্তকে দেখে হঠাৎ ঘরে ঢুকে গেল। তারপরই অবশ্য বেরিয়ে এল। শরৎবাবু লিখছেন, "হঠাৎ অভয়া দ্বার খুলিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, 'জন্মজন্মান্তরের অন্ধ সংস্কারের ধাক্কাটা প্রথমে সামলাতে পারিনি বলেই পালিয়েছিলুম শ্রীকান্তবাবু, নইলে ওটা আমার সত্যিকারের লজ্জা বলে ভাববেন না যেন। ... কী হয়েছিল, জানতে নিশ্চয় আপনার কৌতুহল হচ্ছে।' বলিয়া সে নিজের দক্ষিণ বাহু অনাবৃত করিয়া দেখাইল, বেতের দাগ চামড়ার উপর কাটিয়া কাটিয়া বসিয়াছে। বলিল, 'এমন আরও অনেক আছে, যা আপনাকে দেখাতে পারলুম না। ... আমি যে স্ত্রী হয়েও স্বামীর বিনা অনুমতিতে এতদূরে এসে তার শান্তিভঙ্গ করেছি, — মেয়ে মানুষের এতবড় স্পর্ধা পুরুষ মানুষে সইতে পারে না। এ সেই শাস্তি। ... তিনি তাঁর বর্মা-স্ত্রী নিয়ে সুখে থাকুন, আমি নালিশ কচ্ছিনে, কিন্তু স্বামী যখন শুধুমাত্র বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার করে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কি না, আমি সে কথাই আপনার কাছে জানতে চাইছি।... অধিকার ছাড়া তো কর্তব্য থাকে না শ্রীকান্তবাবু, এটা তো খুব মোটা কথা, তিনিও তো আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু সে শুধু একটা নিরর্থক প্রলাপের মত তার প্রবৃত্তিকে, তার ইচ্ছাকে তো এতটুকু বাধা দিতে পারলে না! অর্থহীন আবৃত্তি তার মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গেই সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল, — কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়ে মানুষ বলে আমারই উপরে? ... যার স্বামী এতবড় অপরাধ করেছে, তার স্ত্রীকে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারা জীবন জীবন্মৃত হয়ে থাকাই নারী-জন্মের চরম

সার্থকতা? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল — সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যে? এতবড় অন্যায়, এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই? ...একজন নির্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী বিনা দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া চাই?" সেই যুগে দুশ্চরিত্র ও অত্যাচারী স্বামীদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও বহিষ্কৃত স্ত্রীদের পক্ষে অভয়াকে দিয়ে শরৎবাবু সমাজের প্রতি অভিযোগের সুরে এই প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। তারপর সেই অভয়াকে দিয়েই দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করালেন, "রোহিনীবাবুকে তো আপনি দেখে গেছেন! তাঁর ভালবাসা তো আপনার অগোচর নেই; এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পঙ্গু করে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্তবাবু।...আমাকে আপনি যা ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবী সন্তানদের আপনারা যা খুশি বলে ডাকবেন, কিন্তু আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না। —এ আমি আপনাকে নিশ্চয় বলে রাখলুম। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটা তারা দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না। তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিস তাদের বাপ-মায়ের হয়তো কিছুই থাকবে না; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেছে, সত্যের বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই। ...সত্যিকার মানুষই মানুষের মধ্যে বড়, না তার জন্মের হিসাবটাই জগতে বড়, এ আমাকে যাচাই করে দেখতে হবে।" যারা অভিযোগ তোলেন, শরৎচন্দ্র মিলন দেখাতে ভয় পেয়েছেন, তারা এই অভয়ার চরিত্র দেখে কি বলবেন? আবার, যথার্থ প্রেমের মিলন মানুষকে আত্মসর্বস্ব, স্বার্থপর করে না, বরং তাকে উদার, পরোপকারী, বিপদের ঝুঁকি নিয়েও অপরের সেবায় উদ্বুদ্ধ করে, সেটাও অভয়ার চরিত্র দিয়ে তিনি ফুটিয়ে তুললেন। বর্মায় প্লেগ মহামারী রূপ নিয়েছে, অনেকে রোগাক্রান্ত আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে পালাচ্ছে। এ অবস্থায় কিছু লক্ষণ দেখে শ্রীকান্তের মনে হল, তারও প্লেগ হয়েছে। হাসপাতালে যাওয়ার আগে অভয়ার সাথে দেখা করতে গেল, কিন্ত অভয়া ছাড়তে রাজি হল না। সেই সেবাযত্ন করবে বলল, শ্রীকান্তের দ্বিধা দেখে বলল, "আমি দায়িত্ব নেব না কে নেবে? এখানে আমার চেয়ে কার গরজ বেশি?" শ্রীকান্ত রাজি না হয়ে বলল, "আমি তো চললুম। ...কিন্তু যাবার মুখে তোমাদের এই নূতন ঘর সংসারের মধ্যে এতবড় একটা বিপদ ফেলে দিয়ে যেতে আর আমার কিছুতেই মন সরছে না অভয়া। ...তুমি শুধু একটি মুহূর্তের জন্য মনটা শক্ত করে বল, আচ্ছা যাও।" অভয়া শ্রীকান্তের এই কথার তৎক্ষণাৎ কোনও উত্তর না দিয়ে তার হাত ধরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজের চোখ মুছল। তারপর "শ্রীকান্তের উত্তপ্ত ললাটের উপর হাত বুলাইয়া কহিল, 'তোমাকে যাও বলতে যদি পারতুম তা হলে নূতন করে ঘর-সংসার পাততে যেতুম না। আজ থেকে আমার নতুন সংসার সত্যিকারের সংসার হল।" এটা কি শরৎচন্দ্র নিছক কাহিনীর জন্য দেখালেন, না কি যথার্থ প্রেম কী কর্তব্যবোধ

আনে দেখালেন? এটা আপনাদের ভাবতে হবে। আবারও বলছি, এই কাহিনী ও অভয়ার মুখে এই বক্তব্য শোনার পর আপনাদের কি মনে হয়, শরৎবাবু সমস্যা তুলেছেন, সমাধান দেখাননি, তাঁর মধ্যবিত্ত দূর্বলতা ছিল বলে মিলন দেখাতে পারেননি?

শ্রীকান্ত উপন্যাসে শরৎচন্দ্র ন্যায় ধর্মের জন্য ধন-সম্পদ, আরাম ত্যাগ করে, স্বামী ও শিশুপুত্র সহ এক রকম গাছ তলায় দাঁড়াতে পারে এরকম একটি নারী চরিত্র সুনন্দাকে অতি ছোট একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে উপস্থিত করেছিলেন। সুনন্দার নিঃসন্তান ভাশুর ও বড় জা তার স্বামীকে পুত্র স্নেহে মানুষ করেছিলেন, পরিবারও গ্রামীণ বর্ধিষ্ণু সচ্ছল ছিল। সুনন্দার বাবা খুবই দরিদ্র পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর কাছেই তার বর্তমান স্বামী অধ্যয়ন করত, সৎ ছেলে দেখে তার সাথেই তার বাবা সুনন্দার বিয়ে দিয়ে তীর্থস্থানে চলে যান এবং যাবার সময় মেয়েকে উপদেশ দিয়ে যান সব সময় ধর্মের পথে চলতে, সুনন্দাকে তিনি নানা শাস্ত্রও পড়িয়েছেন। ভাশুরের সংসারেও ভাশুর ও তার স্ত্রী সুনন্দাকে কন্যার মতো স্নেহ করত, তার একটি পুত্র হওয়ার পর তাকেও খুবই আদর যত্ন করত। এরকম সুখেই সংসার চলছিল। অকস্মাৎ একদিন বজ্রপাতের মতো একটি ঘটনা ঘটল। গ্রামের একটি গরিব পরিবারের বৌ এসে জানাল, তার স্বামী মৃত্যুর সময় তাদের সংসার ও জমি দেখাশোনার জন্য সুনন্দার ভাশুরকে দায়িত্ব দিয়েছিল, কিন্তু সেই জমি এখন ভাশুরই ভোগ করছেন। এই খবর শুনে সুনন্দা জানাল, এই জমি ফেরৎ দিতে হবে, না হলে তারা এই বাড়িতে থাকবে না। ভাশুর তার একান্ত স্নেহের পাত্রী সুনন্দার কাছ থেকে এটা আশা করেননি, ক্রুদ্ধ হয়ে জানালেন, সে যা ইচ্ছা করতে পারে। সুনন্দা স্বামী ও শিশুপুত্রকে নিয়ে বাড়ির কোনও কিছু স্পর্শ না করে বেরিয়ে গিয়ে শ্বশুরের ভিটের ভাঙাচোরা গোয়াল ঘরের মতো দেখতে একটি ঘরে আশ্রয় নিল। এরা ভাবল রাগ পড়ে গেলে আপনিই দু'দিন বাদে ফিরে আসবে, কিন্তু সে এল না। এ বাড়ি থেকে খাবার পাঠাচ্ছে, সে ফেরত পাঠাচ্ছে। এই সুনন্দার চরিত্র সম্পর্কেই শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন, "যে বস্তু অনেকদিন অনেক উপলক্ষে দেখিয়াও বার বার ভুলিয়াছি, সেই কথাই মনে পড়িল যে, সংসারে কোনও-কিছুরই কেবলমাত্র বাহিরটা দেখিয়া কিছুই বলিবার জো নাই। কে বলিবে ওই পোড়ো বাড়িটা শিয়াল-কুকুরের আশ্রয়স্থল নহে! কে অনুমান করিবে ওই কয়খানা ভাঙা ঘরের মধ্যে কুমার-রঘু-শকুন্তলা-মেঘদূতের অধ্যাপনা চলে; ...কে জানিবে উহারই মধ্যে এই বাঙ্গলাদেশের এক তরুণী নারী ধর্মের ও ন্যায়ের মর্যাদা রাখিতে স্বেচ্ছায় অশেষ দুঃখ বহন করিতেছে! ...বস্তুত, এই দারিদ্র্য জিনিসটা সংসারে কতই না অর্থহীন, একজন যদি তাহাকে স্বীকার না করে। এই যে আমাদের সাধারণ বাঙালী ঘরের সামান্য একটি মেয়ে, বাহির হইতে যাহার কোনও বিশেষত্ব নাই — না আছে রূপ - না আছে বস্ত্র-অলঙ্কার ; এই ভগ্ন গৃহের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, কেবল অভাব-অনটনের ছায়া — কিন্তু তবুও যে সে ওই ছায়ামাত্রই, তার বেশি কিছু নয়,

সে কথাও যেন সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়িতে বাকি থাকে না। অভাবের দুঃখটাকে এই মেয়েটি কেবলমাত্র যেন চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া দূরে রাখিয়াছে — জোর করিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করে, এতবড় সাহস তাহার নাই। অথচ মাস কয়েক পূর্বেও ইহার সমস্তই ছিল — ঘরবাড়ি, লোকজন, আত্মীয়বন্ধু-সচ্ছল সংসার, কোনও বস্তুরই অভাব ছিল না — শুধু একটা কঠোর অন্যায়ের ততোধিক কঠোর প্রতিবাদ করিতে সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে একখণ্ড জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করার মতো — মনস্থির করিতে একটা বেলাও লাগে নাই। অথচ, কোথাও কোন অঙ্গে ইহার কঠোরতার কোন চিহ্ন নাই।" এই গ্রামীণ সাধারণ নারী চরিত্র দিয়ে শরৎচন্দ্র কীভাবে ন্যায় ও আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে হয়, তার এক বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। যারা অন্যায় বুঝেও নানা অসুবিধার দোহাই দিয়ে চোখ বুজে থাকে, অন্যায়কে মেনে নেয়, তাদের কাছে সুনন্দা এক অসাধারণ শিক্ষণীয় চরিত্র।

শরৎ সাহিত্যে অন্নদা দিদি, রাজলক্ষ্মী, কমললতা, সাবিত্রী, কিরণময়ী এসব চরিত্র পুরুষ শাসিত সমাজের বিভিন্ন অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বিপথে গেছে। শরৎচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছেন, এর জন্য কে দায়ী? শরৎবাবু শেষ জীবনে ঢাকায় গেলে মোহিতলাল মজুমদার দেখা করেছিলেন। মোহিতলাল জিজ্ঞাসা করলেন, শরৎদা কীরকম আছেন? শরৎবাবু বললেন, দেখ আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না। মোহিতলাল চমকে উঠে বললেন, সেকি! শরৎদা আপনার কাছে তো এটা আশা করিনি। তিনি বললেন তুমি ছোট, তুমি বুঝবে না। মানুষের এমন সময় আসে যখন সে জীবন থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। তারপর বললেন যে, 'অনেকে আমাকে বুঝলে না। তারা ভাবে আমার বঙ্কিমের প্রতি বিদ্বেষ আছে, আমি তাঁর অসম্মান করেছি। অসম্মান করিনি, আমি শুধু বলতে চেয়েছি, নারী সম্পর্কে যে সংস্কার আমাদের সমাজে বদ্ধমূল হয়ে আছে সেটা মিথ্যা, সত্য নয়। তুমি যতবড় সাহিত্যিকই হও না কেন, নারীর জীবনের যেটা ট্র্যাজেডি তাকে তুমি নারীর কলঙ্ক রূপে চিহ্নিত করতে পারো না।' তারপরে তিনি তাঁর নিজের জীবনের একটা ঘটনা বললেন। বললেন, ছোটবেলায় আমাদের গ্রামে এক দিদি ছিল, বালবিধবা, ব্রাহ্মণ কন্যা। সাতাশ বছর বয়স তার। গোটা গ্রামের সকলের বিপদে আপদে, রোগে শোকে এই দিদি ছুটে যেত। তার সেবা যত্ন পায়নি এমন কোনও পরিবার ছিল না। তিনি ছিলেন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের। হঠাৎ যে কি ঘটে গেল, দেখুন বলার ঢংটাও কত শ্রদ্ধার। এই নিষ্কলঙ্ক দিদির হৃদয়ে গ্রামের স্টেশন-মাস্টার কী বিদ্ধ করে গেল, টের পাওয়া গেল যখন দিদি মৃত্যু শয্যায় শায়িত এবং সে কাপুরুষ ভয়ে পালিয়ে গেল। একদিন যে দিদি বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রামের সকলের সেবা করেছে, সেই দিদির মৃত্যুর সময়, এক গ্লাস জল দেওয়ার জন্যও কেউ এল না। গোটা সমাজ তাকে পরিত্যাগ করেছে। এমনকী তার মৃত্যুর পর মৃতদেহও কেউ স্পর্শ করল না। ডোমরা নিয়ে গেল।[৮] এইসব বহু ব্যথা শরৎবাবুর বুকে ছিল।

আবার ভালোবাসার পাত্র বা পাত্রীর চারিত্রিক গুণ ও বলিষ্ঠতা বিপথগামী

মানুষকে কীভাবে পাল্টায় ‘দেনাপাওনা’ উপন্যাসে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন। মুশকিল হচ্ছে আপনাদের উপন্যাসটা না পড়া থাকলে আমার কথা বোঝা যাবে না। আবার কাহিনীর মধ্যে ঢুকলে সময় লাগবে। খুব সংক্ষেপে দু’চার কথায় বলছি। নায়ক জীবানন্দ ব্যাভিচারী, দুর্দান্ত অত্যাচারী জমিদার, প্রজার উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করে। তার চাই টাকা আর চাই প্রতিদিন নতুন নতুন মেয়েমানুষ। শরৎবাবু দেখাচ্ছেন বিশ বছর ধরে তার এই বীভৎস লীলা চলছে। কত নারীর কত সৌন্দর্য, কত লজ্জা, কত মর্যাদা, কত শোভা তার এই পাশবিকতার তলায় তলিয়ে গেছে, এতটুকু দাগ পাষণ্ডের মনের মধ্যেও নেই। কতটা নিষ্ঠুর হলে সে মন্দিরের ষোড়শীকে বলতে পারে, তুমি কাঁদছ কেন? তুমি তো সন্ন্যাসিনী। এর আগে যারা আমার ঘরে কেঁদেছিল তাদের স্বামী ছিল, পুত্র ছিল। তোমার তো কেউ নেই। তুমি কাঁদছ কেন? এই হল জীবানন্দ চৌধুরীর চরিত্র। অনেক আগে অতি অল্প বয়সে সেদিনের অলকা, আজকের ষোড়শীকে বিশেষ বিপদে পড়ে জীবানন্দকে বিয়ে করতে হয়েছিল, কিন্তু সেই রাতেই পুলিশের তাড়ায় জীবানন্দ পালিয়ে যায়। আর দুজনের যোগাযোগ হয়নি। এখন সে চণ্ডী মন্দিরের ভৈরবী, ষোড়শী নামে খ্যাত। প্রথমে কেউ কাউকে চিনতে পারেনি। কারণ বহুদিন আগে বিয়ের রাতেই পরস্পরের দেখা হয়েছিল। পরে ষোড়শী জানল জীবানন্দই তার সেই স্বামী। কিন্তু জীবানন্দ যখন প্রজাদের উপর অত্যাচার করছে, ষোড়শী তখন প্রজাদের সংঘবদ্ধ করছে জমিদারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে লড়বার জন্য। জীবানন্দ ও তার সহযোগীরা ষোড়শীকে অপবাদ দিয়ে মন্দির থেকে তাড়িয়েছে মন্দিরের সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য। আবার ষোড়শীর বিদায়ের সময়, জীবানন্দের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল। ষোড়শীকে বলল, এতদিন ভাবতাম কী করে তোমাকে তাড়াব, আজ ভাবছি, কি করে তোমাকে ধরে রাখব। কারণ ইতিমধ্যে ষোড়শীর এই চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহস, সততা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, বলিষ্ঠতা, সংযম সবকিছু দেখে জীবানন্দের জীবনে এই প্রথম একটি নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জাগল, ধীরে ধীরে ভালোবাসা এল। এই ভালোবাসার ফলশ্রুতিতে জীবানন্দের জীবনে এল আমূল পরিবর্তন। ভালোবাসা কী করে, শরৎবাবু তা দেখাচ্ছেন। যে জলের মতো মদ খেত, সে মদ ছেড়ে দিল। কয়েকদিন পরে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তার তাকে বলছে, ‘আপনি মদ খান। নাহলে, হার্টফেল করবে।’ জীবানন্দ এর আগেও মদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও মদ ছাড়তে পারেনি। আবার ধরেছে। জীবানন্দ উত্তর দিচ্ছে ‘ডাক্তার, চিরদিন আমি ফেল করেছি, হার্ট ফেল করেনি। আজ যদি হার্ট ফেল করে করুক, কিন্তু আমি ফেল করবো না। আমি আর মদ খাবো না।’ প্রজাদের থেকে যা জমি জীবানন্দ কেড়ে নিয়েছে, নিজেই ফেরত দিচ্ছে। প্রজাদের বলছে, কোর্টে আমার বিরুদ্ধে লড়াই কর। দেখুন, যথার্থ উন্নত চরিত্রের প্রতি ভালোবাসা মানুষকে কীভাবে পাল্টায়। এই সবটা কিন্তু ষোড়শীর ব্যক্তিত্ব, চরিত্রের বলিষ্ঠতা, কঠোর সত্যনিষ্ঠার জন্য। এ জন্যই জীবানন্দের মনে সে জায়গা করে নিয়েছে। তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকেই জীবানন্দের

এই পরিবর্তন এসেছে। প্রজারা জমি উদ্ধারের জন্য মামলা করতে যাচ্ছে, এর জন্য জীবানন্দ নিজের শাস্তিও মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু তার দুষ্কর্মের অন্য সাকরেদরা, জোতদার, নায়েব, গোমস্তারা ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু কিছুতেই জীবানন্দকে নিরস্ত করতে পারছে না। তখন তারা বাধ্য হয়ে ছুটে গেল ষোড়শীর কাছে, তার শরণাপন্ন হল বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য। সব শুনে ষোড়শী ছুটে এল জীবানন্দকে নিয়ে যাবার জন্য। জীবানন্দ রাজী হচ্ছিল না, বলল 'চলে গেলে প্রজাদের সমস্যা কি করে মিটবে, প্রজাদের কাছে পুরুষানুক্রমে ঋণ কি করে শোধ হবে?' ষোড়শী জীবানন্দের বুকে মাথা রেখে বলল, 'সে ভার আমার, পুরুষানুক্রমেই তাদের ঋণ শোধ করা হবে।' এ কথার তাৎপর্য কী? সাহিত্যে বেড সীন না হলে যারা নরনারীর প্রেম বুঝতে পারে না, তারা বুঝবে না।

এমনকী শরৎবাবুর প্রথম জীবনের মাত্র একুশ বছর বয়সে লেখা 'দেবদাস' পড়ুন। শরৎ সাহিত্য আমি যতদূর পড়েছি, তাঁর সাহিত্যে একমাত্র প্রসটিটিউট ক্যারেকটার হচ্ছে চন্দ্রমুখী। বাকি কেউই নয়। রাজলক্ষ্মীও নয়, সাবিত্রীও নয়, আরও যারা আছে তারাও কেউ নয়। যখন দেবদাস শোকের আঘাতে মদ খাওয়া শুরু করল, তার বন্ধু তাকে নিয়ে গেল চন্দ্রমুখীর ঘরে। চন্দ্রমুখী তাকে ধরতে গেলে সে বলেছে, 'আমাকে ছুঁয়ো না। আমি এখনও মাতাল হইনি। আমি তোমাদের ঘৃণা করি।' দেবদাসের এই তেজ, ওদের জীবনের প্রতি এই ঘৃণা চন্দ্রমুখীর জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এল, সে দেবদাসকে ভালোবাসতে শুরু করল, অসাধারণ সেই ভালোবাসা। এই কাহিনী শরৎবাবুর অল্প বয়সের সৃষ্টি হলেও কোথাও কৃত্রিম মনে হয় না। দেবদাসের প্রতি আকৃষ্ট চন্দ্রমুখী শেষ পর্যন্ত তার বৃত্তি পরিত্যাগ করল, গয়না পরা ছেড়ে দিল, সাজপোশাক ছেড়ে দিল, চূড়ান্ত অভাবগ্রস্ত হল, কিন্তু পুরনো পেশায় ফিরে গেল না, সে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হল। এমন রূপান্তর হল যে, মরণাপন্ন দেবদাসের কাছে একদিকে পার্বতী, অন্যদিকে চন্দ্রমুখী দু'টি মুখ পাশাপাশি ভেসে এল। এভাবে তিনি ঐ বয়সেই অসামান্য নৈপুণ্যে এক চরিত্র সৃষ্টি করলেন। ভালোবাসা কী করতে পারে, মানুষকে কী করে পাল্টায়, শরৎসাহিত্যে এরকম আরও পাবেন।

আবার ষোড়শী কেন চণ্ডীগড়ের চণ্ডীর মর্যাদাময় আসন ভৈরবীপদ ত্যাগ করে চলে গেল এবং শেষপর্যন্ত তার পূর্ববিবাহিত স্বামীকে গ্রহণ করল, ধর্মপ্রাণ ভৈরবী কেন গার্হস্থ্য জীবনে এল, এর কারণ দেখাতে গিয়েও শরৎবাবু দেখালেন ভৈরবী জীবনের কঠোর কঠিন ধর্মীয় আচরণ সর্বস্ব জীবনের অন্তরালে ষোড়শীর অজ্ঞাতসারে নারীজীবনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত ছিল। শরৎবাবুর ভাষায় বলতে গেলে, "এতদিন জীবনটাকে সে যেভাবে পাইয়াছে সেইভাবেই গ্রহণ করিয়াছে। সে চণ্ডীর ভৈরবী — ইহার যে দায়িত্ব আছে, কর্তৃত্ব আছে, সম্পদ আছে, বিপদ আছে, ...ভাগ্যনির্দিষ্ট সেই পরিচিত খাদের মধ্য দিয়াই ষোড়শীর জীবনের এই কুড়িটা বছর প্রবাহিত হইয়া গেছে, ইহা ভৈরবীর জীবন বলিয়াই সে

অসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছে; একটা দিনের তরে আপনার জীবন নারী জীবন বলিয়াই ভাবে নাই। কত সংখ্যাতীত রমণী — কেহ ছোট, কেহ বড়, কেহ বা সমবয়সী — তাহাদের কত প্রকারের সুখ-দুঃখ, কত প্রকারের আশা-ভরসা, কত ব্যর্থতা, কত অপরূপ আকাশ কুসুমের নির্বাক ও নির্বিকার সাক্ষী হইয়া সে আছে। দেবীর অনুগ্রহলাভের জন্য কতকাল ধরিয়া কত কথাই না গোপনে মৃদুকণ্ঠে তাহাকে ব্যক্ত করিয়াছে, ...এ সমস্তই তাহার চোখে পড়িয়াছে, পড়ে নাই কেবল রমণী হৃদয়ের কোন অন্তঃস্থল ভেদিয়া এই সকল সকরুণ অভাব ও অনুযোগের স্বর উত্থিত হইয়া এতকাল ধরিয়া তাহার কানে আসিয়া পশিয়াছে। ইহাদের গঠন ও প্রবৃত্তি এমনি কোন্ এক বিভিন্ন জগতের বস্তু, যাহাকে জানিবার বা চিনিবার হেতু, কোন প্রয়োজন তাহার হয় নাই, সেই প্রয়োজনের প্রথম আঘাত এইখানে এই পরিত্যক্ত অন্ধকার আলয়ে এই প্রথম তাহার গায়ে লাগিল।” কীভাবে লাগল সেটাও শরৎচন্দ্র সুনিপুণভাবে দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন ধর্মীয় আচরণনিষ্ঠ জীবনে স্বাভাবিক সার্থকতা নেই। ষোড়শীকে যখন মন্দির থেকে সরাবার জন্য একদিকে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী ও অন্যদিকে জোতদার জনার্দন রায় চক্রান্ত করছিল, তখন সেই দুঃসময়ে ষোড়শীর পাশে দাঁড়াল জানার্দন রায়েরই মেয়ে হৈম তার ব্যারিস্টার স্বামী নির্মলকে নিয়ে। হৈম বাল্যকাল থেকেই ষোড়শীকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত এবং বিশ্বাস করত যে ষোড়শীর দয়াতেই সে পুত্র সন্তান লাভ করেছে। হৈম স্বামী সহ ষোড়শীর কাছে বিদায় নিয়ে গেছে তার স্বামীর কর্মস্থল লখনৌতে যাবে বলে। তখন শরৎচন্দ্রের ভাষায় ষোড়শী হৈম সম্পর্কে বসে ভাবছে, “...তাহার নিদ্রিত পুত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে — তাহাকে শান্ত করিয়া আবার ঘুম পাড়াইতে হইবে; কিন্তু ইহাতেই কি অবসর মিলিবে? তখনও কত কাজ বাকী থাকিয়া যাইবে। অন্তরাল হইতে স্বামীর খাওয়াটুকু পর্যবেক্ষণ করা চাই — ত্রুটি না হয়; ছেলেকে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতে হইবে — সে অভুক্ত না থাকে; পরে নিজের খাওয়া লইয়া যেমন-তেমন করিয়া বাকী রাতটুকু কাটাইয়া আবার প্রত্যুষে উঠিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই। তাহার কত রকমের প্রয়োজন, কত রকমের গুছান-গাছান। তাহার স্বামী, তাহার পুত্র, তাহার লোকজন, দাসী-চাকর তাহাকে আশ্রয় করিয়াই যাত্রা করিবে। দীর্ঘপথে কাহার কি চাই — তাহাকেই যোগাইতে হইবে, তাহাকে সমস্ত ভাবিয়া সঙ্গে লইতে হইবে। নিজের জীবনটাকে ষোড়শী কোনদিন পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখে নাই, আলোচনা করিবার কথাও কখনো মনে হয় নাই, তবুও সে মনের মাঝখানে গৃহিনীপনার সকল দায়িত্ব, সকল ভার, জননীর সকল কর্তব্য, সকল চিন্তাকে কে যেন কবে সুনিপুণ হাতে সম্পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া দিয়া গেছে। তাই কিছু না জানিয়াও সে সব জানে, কখনও কিছু না শিখিয়াও হৈমর সকল কাজ তাহারি মত নিখুঁত করিয়া করিতে পারে, এই কথাই তাহার মনে হইল। .....তাহার চমক ভাঙ্গিয়া মনে পড়িল সে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী। এতবড় সম্মানিত নারী এ প্রদেশে আর কেহ নাই। সে সামান্য একজন রমনীর অত্যন্ত সাধারণ গৃহস্থালীর

অতি তুচ্ছ আলোচনায় মুহূর্তের জন্যও আপনাকে বিহ্বল করিয়াছে মনে করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল।" তখন লজ্জা পেলেও ষোড়শীর মধ্যে এই চিন্তা কাজ করে গেছে, যেটা বহু যুগ ধরে নারী মননে লুকনো আকাঙ্ক্ষা। তাই শেষ পর্যন্ত ষোড়শী যখন স্বেচ্ছায় ভৈরবীপদ ত্যাগ করে সই করল, বিস্মিত হৈমর স্বামী ব্যারিস্টার নির্মল প্রশ্ন করল, "ভৈরবীর আসন ত্যাগ করে যে আপনি ইতিমধ্যে ছাড়পত্র পর্যন্ত সই করে রেখেছেন, এ খবর ত আমাকে ঘুণাগ্রে জানাননি!" তারপর জিজ্ঞাসা করিল ষোড়শীর পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃতুল্য ফকির সাহেবের পরামর্শে কি সে এ কাজ করেছে? ষোড়শী জবাব দিল, "না, তিনি আজ সকাল পর্যন্ত কিছুই জানতেন না, এবং ওই যাকে ছাড়পত্র বলছেন সে আমার কাল রাতের রচনা, যিনি এ কাজে আমাকে প্রবৃত্তি দিয়েছেন, শুধু তাঁর নামটিই আমি সংসারে সকলের কাছে গোপন রাখবো।" যার নাম গোপনে রাখতে চেয়েছে ষোড়শী, সে হচ্ছে হৈম, তার সেই স্বাভাবিক সংসারী নারী জীবন, এর কাছে তার সম্মানীয় ভৈরবী জীবন তুচ্ছ হয়ে গেছে। আবার এই হৈম-র স্বামী নির্মল কার্য উপলক্ষ্যে ষোড়শীর সান্নিধ্যে এসে তার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আকৃষ্ট হচ্ছিল, এটা টের পেয়ে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়ে একে অনুচিত গণ্য করে এবং হৈম-র ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায় ষোড়শী কৌতুক মিশ্রিত মৃদু তিরস্কারে নির্মলকে মোহমুক্ত হতে সাহায্য করল। ধর্মীয় সাধনায় অনুক্ষণ লিপ্ত হয়েও যে অনুশোচনায় দগ্ধ নারীর সান্ত্বনা মেলে না, এই সত্যটি শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বের কমললতা চরিত্রের মধ্যে দিয়েও উদঘাটিত করে দেখালেন। কমললতার জীবন কাহিনীও অত্যন্ত ট্র্যাজিক। কলকাতার ব্যবসায়ী বাবার কাছে থাকত, সতের বছর বয়সে বিধবা হয়, একুশ বছর বয়সে বাবারই এক কর্মচারীর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠে ও সে সন্তানসম্ভবা হয়। সেই কর্মচারীর ভাইপো যতীন কমললতার থেকে বয়সে ছোট। কমললতাদের বাড়িতে থেকে পড়ত, সে কমললতাদিদিকে খুবই ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করত। নিরুপায় কমললতা আত্মহত্যার জন্য যতীনকে বিষ এনে দিতে অনুরোধ করল। যতীন কেঁদে অস্বীকার করল, বলল আত্মহত্যা করা পাপ। কমললতার খবর শুনে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পিতা বেদনায় ভেঙে পড়লেন। শেষে তাঁরই গুরুদেবের পরামর্শে কমললতাকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে সেই কর্মচারী মন্মথের সাথে কণ্ঠিবদলের সিদ্ধান্ত নিলেন। কমললতা জানত, মন্মথ তাকে ভালোবেসে স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। ইতিমধ্যে কণ্ঠিবদল হয়ে গেছে, পরে কমললতা বাড়ির দাসীর কাছ থেকে জানল, মন্মথ তার বাবার কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে এই মিথ্যা অভিযোগ করে যে কমললতার সন্তানসম্ভবা হওয়ার জন্য সে দায়ী নয়, দায়ী তার ভাইপো যতীন এবং যতীনকে ডেকে এনে জানাল যে, এই অভিযোগ কমললতাই করেছে। যতীন জানত দিদি কখনও মিথ্যে বলে না। এই অপ্রত্যাশিত মিথ্যা অভিযোগে সে ব্যথায় আত্মহত্যা করল। মন্মথের এই কদর্য, নিষ্ঠুর, মিথ্যাবাদী চরিত্র দেখে ঘৃণায় কমললতা তাকে ত্যাগ করে অনুতাপের জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে

বৈষ্ণবী জীবনের পথে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত মুরারীপুকুর মঠে আশ্রয় নিল। তার সম্পর্কে শরৎচন্দ্র মুগ্ধ শ্রীকান্তের ভাষায় লিখছেন, "আর ঐ বৈষ্ণবী কমললতা! ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান। ওর ছন্দের মিল নাই, ব্যাকরণে ভুল আছে, ভাষার ত্রুটি অনেক, কিন্তু ওর বিচার ত সেদিক দিয়া নয়। ও যেন তাহাদেরই দেওয়া কীর্তনের সুর — মর্মে যাহার পশে সেই শুধু তাহার খবর পায়। ও যেন গোধুলি আকাশে নানা রঙের ছবি। ওর নাম নাই, সংজ্ঞা নাই — কলাশাস্ত্রের সূত্র মিলাইয়া ওর পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।" মঠের সাধনায় নিবেদিত প্রাণ কমললতার কার্য পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যা বলেছেন, সেটা যারাই কোনও সংগঠনের দায়িত্বে আছে, তাদের কাছে খুবই শিক্ষণীয়। তিনি লিখছেন, "এই দুটা দিন এখানে থাকিয়া লক্ষ করিতেছিলাম যে, সকলের আড়ালে থাকিয়া মঠের সমস্ত গুরুভারই কমললতা একাকী বহন করে। তাহার কর্তৃত্ব সকল ব্যবস্থায়, সকলের পরেই। কিন্তু স্নেহে, সৌজন্যে ও সর্বোপরি সবিনয় কর্মকুশলতায় এই কর্তৃত্ব এমন সহজ শৃঙ্খলায় প্রবহমান যে, কোথাও ঈর্ষা, বিদ্বেষের এতটুকু আবর্জনাও দেখিতে পায় না।" বাস্তবে কমললতা সকলের আস্থায়, ভালোবাসায় এবং ছোটদের শ্রদ্ধায় মঠের মূল প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তবু সে এখান থেকে চলে যেতে চায়। তার একটি কারণ শান্ত, সরল, পরোপকারী, দয়ালু কবি গহর কমললতাকে ভালোবাসে, কিন্তু কখনও তা ব্যক্ত করে না, কিছু প্রত্যাশাও করে না। তাই শরৎবাবু বলছেন, "ভালো যদি সে বাসিয়াও থাকে মুখ ফুটিয়া কোনদিন হয়ত সে বলিবেও না কোথাও পাছে কোন অপরাধ স্পর্শে, বৈষ্ণবী ইহা জানে। সেই অনতিক্রম্য বাধায় চিরনিরুদ্ধ প্রণয়ের নিষ্ফল চিত্তদাহ হইতে এই শান্ত আত্মভোলা মানুষটিকে অব্যাহতি দিতেই বোধকরি কমললতা পলাইতে চায়।" কিন্তু এটা অন্যতম হলেও প্রধান কারণ নয়, প্রধান কারণ দেখাবার জন্যই কমললতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। সেই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র নিজেই লিখছেন, বৈষ্ণব ধর্মের "রসের আরাধনায় আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়াও তাহার একান্ত নারী-প্রকৃতি আজও হয়ত রসের তত্ত্ব পায় নাই, সেই অসহায় অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তি এই নিরবচ্ছিন্ন ভাব-বিলাসের উপকরণ সংগ্রহে হয়ত আজ ক্লান্ত, দ্বিধায় পীড়িত। সেই তাহার পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত মন আপন অজ্ঞাতসারে, কোথায় যে অবলম্বন খুঁজিয়া মরিতেছে, বৈষ্ণবী তাহার ঠিকানা জানে না — আজ তাই সে চমকিয়া বারে বারে তাহার বিগত জনমের রুদ্ধ দ্বারে হাত পাতিয়া অপরাধের সান্ত্বনা মাগিতেছে।" কমললতার প্রথম স্বামীর নামও ছিল শ্রীকান্ত। তাই শ্রীকান্তের ভাষায় শরৎচন্দ্র তারপরই লিখছেন, "তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারি আমার 'শ্রীকান্ত' নামটাকেই পাথেয় করিয়া আজ সে খেয়া ভাসাইতে চায়"। এইভাবেই শরৎচন্দ্র দেখালেন, গভীর নিষ্ঠায়, ধর্মীয় চর্চায় নিবেদিত থেকেও বৈষ্ণবী গ্লানিবোধের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না এবং একান্ত নারী প্রকৃতিও তৃপ্ত হচ্ছে না।

শরৎবাবুকে বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় অনুরোধ করে বলেছিলেন,

আপনি জমিদারদের চরিত্র সবই অত্যাচারী দেখিয়েছেন। ভালো জমিদারও তো আছে। ধার্মিক, প্রজাবৎসল, এই রকম চরিত্র নিয়ে একটা উপন্যাস লিখুন। শরৎচন্দ্র লিখলেন 'বিপ্রদাস'। তখন দেশে হিন্দু রিভাইভ্যালিজম-এর প্রভাব ছিল, তারও কিছু প্রচ্ছন্ন প্রভাব এই উপন্যাসে আছে। উপন্যাসটির প্রথমদিকে আদর্শ ধর্মপরায়ণ মাতৃভক্ত জমিদার চরিত্র আঁকার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত শরৎবাবুর সেক্যুলার মানসিকতাই প্রাধান্য পেল। দয়াময়ী বিপ্রদাসের বিমাতা, কিন্তু নিজের সন্তান দ্বিজদাসের থেকেও বিপ্রদাসকে অধিক স্নেহ ও বিশ্বাস করেন। প্রতিটি পদক্ষেপে বিপ্রদাসই তাঁর ভরসা, বিপ্রদাসও মাকে গভীর ভক্তি করেন, মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করেই চলেন। কিন্তু নতুন সমস্যা এসে এই সম্পর্কে বিপত্তি ঘটাল। বিপ্রদাস তার বোনের সাথে বন্ধু বড়লোক শশধরের বিয়ে দিয়েছিল। দয়াময়ীর পুকুর প্রতিষ্ঠার ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে বোন-ভগ্নিপতি এসেছে। ভগ্নিপতির সাথে কথায় কথায় বিপ্রদাস জানতে পারল ভগ্নিপতি জালিয়াতি করে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে। স্বাভাবিকভাবে বিরক্ত বিপ্রদাস শশধরকে চলে যেতে বলল। ধূর্ত শশধর স্ত্রীকে বলল, হয় আমার সাথে ফিরে চল, না হয় এ বাড়িতেই সারাজীবন থাকবে, আমাদের বাড়িতে যেতে পারবে না। বোন কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে মা দয়াময়ীকে জানাল, দাদা স্বামীকে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাকেও চলে যেতে হচ্ছে। দয়াময়ী কিছুই জানতেন না, হঠাৎ উৎসবের বাড়িতে যেন বজ্রাঘাত ঘটল। দয়াময়ী প্রথমে ভাবতেই পারেননি বিপ্রদাস এইরকম বলতে পারে। ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। বিপ্রদাস জানাল, সে সত্যই শশধরকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। এই অপত্যাশিত উত্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে দয়াময়ী বললেন, "ন্যায়-অন্যায়ের ঝগড়া থাক। মেয়ে-জামাই আমার চিরকালের মত পর হয়ে যাবে — এ আমি সইবো না। শশধরের কাছে তুমি ক্ষমা চাও বিপিন।" বিপ্রদাস জবাব দিল, "সে হয় না মা, সে অসম্ভব।" মা জবাব দিলেন, "সম্ভব-অসম্ভব আমি জানি নে। ক্ষমা তোমাকে চাইতেই হবে।" বিপ্রদাস চুপ করে রইল। আরও ক্রুদ্ধ হয়ে দয়াময়ী বললেন, "বাড়ি তোমার একার নয় বিপিন। কাউকে তাড়াবার অধিকার কর্তা তোমাকে দিয়ে যাননি, ওরা এ বাড়িতে থাকবে।" শরৎচন্দ্র লিখছেন, "...একদিকে মেয়ে-জামাই, আর একদিকে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিপিন। যে শিশুকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, সে সকল আত্মীয়ের বড় আত্মীয়, দুঃখের সান্ত্বনা, বিপদের আশ্রয় — যে ছেলে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়। এ অমর্যাদা তাহাকে মৃত্যু দিবে কিন্তু সঙ্কল্পচ্যুত করিবে না। বুঝিলেন সর্বনাশের অতলস্পর্শ গহ্বর তাঁর পায়ের নীচে, এ ভুলের প্রতিবিধান নাই, প্রত্যাবর্তনের পথ নাই — পরিণাম ইহার দৈবের মতই অমোঘ, নির্মম ও অনন্যগতি। তথাপি নিজেকে শাসন করিতে পারিলেন না। অদম্য ক্রোধ ও অভিমানের বাত্যায় তাঁহাকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিল, কটুকণ্ঠে বলিলেন, এ তোমার অন্যায় জিদ বিপিন। তোমার জন্যে মেয়ে-জামাইকে জন্মের মত পর করে দেব এ হয় না বাছা। তোমার যা ইচ্ছে করগে। শশধর এসো তোমরা আমার সঙ্গে

— ওর কথায় কান দেবার দরকার নেই।” এরপর বিপ্রদাস শিশুপুত্র ও স্ত্রী সহ গৃহত্যাগ করলেন। দয়াময়ী ভাবতে পারেননি, তাঁর চিরদিনের একান্ত বাধ্য ছেলে বিপ্রদাস তাঁর নির্দেশ এভাবে অমান্য করবে। তাই ক্রোধান্ধ হয়ে তাঁর প্রাণাধিক সন্তানকে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। সন্তান সর্বসমক্ষে তাঁকে অমান্য করেছেন এই ক্রোধ তাঁকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে দিল, ধর্মপরায়ণ স্নেহময়ী মায়ের ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায় বোধ কাজ করতে দিল না। অন্যদিকে মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করতে অভ্যস্ত বিপ্রদাসের ন্যায়বিচার ও আত্মসম্ভ্রমবোধ তাকে মায়ের নির্দেশ লঙ্ঘন করাল এবং শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগ করাল। এইভাবে শরৎবাবু দেখালেন প্রাচীন ধর্মভিত্তিক নৈতিকতা আর পারিবারিক ঐক্যকে এবং মা ও সন্তানের সুসম্পর্ককে রক্ষা করতে পারে না। পিতামাতার নির্দেশ মান্য করার চেয়েও ন্যায়, যৌক্তিকতা ও মর্যাদাবোধ বড়। অন্যদিকে অন্ধ ক্রোধ — যুক্তি বিচার, আত্মসংযম, স্নেহমমতাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিষ্ক্রিয় করে কতবড় বিপর্যয় ডেকে আনে! এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখালেন। দেখালেন, স্বামী-স্ত্রীর পূর্বতন ধর্মীয় আদর্শ ভিত্তিক সম্পর্কের মধ্যেও একটা অভাববোধ কাজ করছে। বিপ্রদাসের স্ত্রী সতী, পরস্পর পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ, কোনও ভুল বোঝাবুঝি তিক্ততার লেশমাত্র নেই। এই সতীরই ছোট বোন বন্দনা। আধুনিক, শিক্ষিতা, বিপ্রদাসের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। এই বন্দনা অপ্রত্যাশিতভাবে বিপ্রদাসকে প্রশ্ন করল, “মেজদিদিকে আপনি কি সত্যিই ভালবাসেন? ছেলেবেলায় আপনাদের বিয়ে হয়েছে — সে কতদিনের কথা — কখনো কি এর অন্যথা ঘটেনি?”.... বিপ্রদাস প্রশ্ন করল, “.... আমাকে তোমার সন্দেহ হয়?” বন্দনা জবাব দিল, “হয়। আপনি অনেক বড় মানুষ, কিন্তু তবুও মানুষ। মনে হয় কোথায় যেন আপনি ভারী একলা, সেখানে আপনার সঙ্গী কেউ নেই। একথা কি সত্যি নয়?” বিপ্রদাস এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিল না, বলিল, “স্ত্রীকে ভালোবাসা যে আমার ধর্ম বন্দনা।” বন্দনা বলল, “ধর্ম যতদূর প্রসারিত ততদূর আপনি খাঁটি, কিন্তু তার চেয়েও বড় কি সংসারে কিছু নেই।” বিপ্রদাস জবাব দিল, “দেখতে ত পাইনে বন্দনা।” বন্দনা বলল, “আমি দেখতে পাই মুখুজ্যেমশাই। বলবো সে কথা?” শরৎচন্দ্র বলছেন, “বিপ্রদাসের মুখ সহসা পাণ্ডুর হইয়া উঠিল, — বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ মুখে যেন রক্তের লেশমাত্র নেই, দুই হাত সম্মুখে বাড়াইয়া বলিল, ‘না, একটি কথাও নয় বন্দনা’।” এইভাবে বিপ্রদাস সত্যের মুখোমুখি হওয়া এড়িয়ে গেল, কিন্তু পরে বিপ্রদাসই অন্য কথায় বন্দনার কাছে স্বীকার করল তার অভাববোধের কথা। বন্দনা যখন বিপ্রদাসের প্রতি তার ভালোবাসা ব্যক্ত করল এবং বিপ্রদাস তাকে এই feeling অন্যভাবে চালিত করতে বলল, তখন বন্দনা চোখের জল মুছে ফেলে অনুরোধ করল, “আমার একটি ভিক্ষে রইলো মুখুজ্যেমশাই, আমার কথা যেন কাউকে বলবেন না।” বিপ্রদাস জবাব দিল, “না, বলবো না। বলার লোক যে আমার নেই সে ত তুমি নিজেই জানতে পেরেছো।” তারপরেই বিপ্রদাস প্রশ্ন করল, “এই বিপুল সংসারে

আমি যে একা একথা তুমি কি করে বুঝেছিলে বন্দনা?" এখানেই শরৎচন্দ্র দেখালেন, বিপ্রদাস-সতীর ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক দাম্পত্য জীবনে দায়িত্ব কর্তব্য সবই আছে, কিন্তু নেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব, প্রেমের মাধুর্য। ফলে আধুনিক মননের চাহিদা অনুযায়ী বিপ্রদাসের জীবনে নিঃসঙ্গতা থেকে গেছে। এই বইতে শরৎচন্দ্র আরেকটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। বিপ্রদাসের ব্যক্তিত্ব, সৎ সাহস, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা এবং কর্তব্যপরায়ণতায় অভিভূত হয়ে বন্দনার মধ্যে বিপ্রদাসের প্রতি ভালোবাসা জাগল এবং সঙ্কোচের সাথে সে বিপ্রদাসের কাছে ব্যক্ত করল। বন্দনা সুশিক্ষিতা, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ভদ্রমনের। তখনকার দিনের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী বিপ্রদাস চাইলে তাকে বিয়ে করে কলকাতায় রেখে দুই স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে পারত। আর আজকাল তো একদল বিয়ে না করেও আলাদা জীবন যাপন করে। কিন্তু বিপ্রদাস ভালোবাসার স্বীকৃতি দিয়েও এই নোংরা পথে গেল না। ব্যাকুল কণ্ঠে বন্দনা যখন প্রশ্ন করল, "…. মিথ্যেই যদি হতো এতটুকু ভালবাসাই কি আপনার পেতুম? পাইনি কি আমি।" বিপ্রদাস জবাব দিল, "পেয়েছো বৈ কি বন্দনা, তুমি অনেকখানিই পেয়েছ। নইলে তোমার হাতে আমি খেতুম কি করে? তোমার রাত্রিদিনের সেবা নিতে পারতুম আমি কিসের জোরে? কিন্তু তাই বলে কি গ্লানির মধ্যে, অধর্মের মধ্যে নিজে নেমে দাঁড়াবো, তোমাকে টেনে নামাবো? যারা আমার পানে চেয়ে চিরদিন বিশ্বাসে মাথা উঁচু করে আছে সমস্ত ভেঙ্গেচুরে তাদের হেঁট করে দেব? এই কি তুমি বলো?" ব্যাকুল বন্দনা প্রশ্ন করল, "কোনদিনই কি এর পরিবর্তন নেই মুখুজ্যেমশাই?" বিপ্রদাস উত্তর দিল, "কিন্তু পরিবর্তনের বা দরকার কিসের? ভালো তোমাকে বেসেছি, রইলো তোমার সেই ভালবাসা আমার মনের মধ্যে, — এখন থেকে সে দেবে আমাকে দুঃখে সান্ত্বনা, দুর্বলতায় বল, ভার যখন একাকী বইতে পারবো না তখন দেবো তোমাকে ডাক। সে-ও রইলো আজ থেকে তোমার জন্য তোলা।" বন্দনা এই আবেদন সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করতে না পারায় বিপ্রদাস আবার বোঝানোর জন্য বলল, "কিন্তু ভালবাসার একটিমাত্র পথই তোমাদের চোখে পড়ে আর সব থাকে বন্ধ। তাই সেদিনের কথাগুলো আমার বুঝতে পারনি। একবার দেখে এসো গে আমার ছোটভাই দ্বিজ আর তোমার দিদি, তার বৌদিদিকে। দৃষ্টি অন্ধ না হলে দেখতে পাবে কি করে শ্রদ্ধা গিয়ে মিশেছে ভালবাসার সঙ্গে। রহস্য-কৌতুকে, আদরে-আহ্লাদে, নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় সে শুধু তার বৌদি নয়, সে তার বন্ধু, সে তার মা। সেই সম্বন্ধ তো তোমার-আমারও, ঠিক তেমনি করেই কেন তুমি আমাকে নিতে পারলে না বন্দনা?" এই ধরনের সমস্যা কারও কারও জীবনে আসে, কিন্তু ভালোবাসায় এতটুকু দুর্বল না হয়ে কিভাবে tackle করতে হয়, এটা শরৎচন্দ্র দেখিয়ে দিলেন। এটাও আজকের দিনের সমস্যা।

আবার দেখুন, আমাদের জীবনে যখন সমস্যা আসে, রাগ ক্রোধ আসে, মানুষ তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, যুক্তিশূন্য হয়ে যায়। যা ভাবে না, বলতে চায়

না, রাগের মাথায় তাই বলে বিপত্তি বাধায়। এটা শরৎবাবুর 'বিন্দুর ছেলে'তে আছে। বিন্দুর সঙ্গে তার বড় জায়ের কী মধুর সম্পর্ক, বড় জায়ের ছেলেকে নিজের ছেলে হিসেবে মানুষ করছে, এটা দেখিয়েছেন। ছেলের নাম অমূল্য। তাকে মানুষ করা নিয়ে অন্যদের সাথে বিন্দুর দ্বন্দ্ব সংঘাত দেখিয়েছেন। লুকিয়ে বড় জা ছেলেকে ফাইনের টাকা দিয়েছে। বিন্দুর স্বামীর এক পিসতুতো বোনের ছেলে ওই বাড়িতে এসেছে। সে শহরের ছেলে, চুরুট খাওয়া থেকে শুরু করে সব বদ অভ্যেস তার আছে। তার সংস্পর্শে অমূল্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই উৎকণ্ঠায় ক্ষিপ্ত হয়ে বিন্দু আঘাত করল তার খুবই আদরের দিদি বড়-জাকে। 'তুমি টাকা দিলে কেন?' বড়-জা বলল, 'আমি টাকা দিতে পারি না? তুই তো দিস।' বিন্দু বলছে, 'আমি দিই আমার স্বামীর টাকা। তুমি দাও কার টাকা?' সংসার তখন চলছিল বিন্দুর স্বামীর ওকালতির টাকায়। বিন্দু বলে, 'তুমি জানো না কার টাকায় সংসার চলে!' বড় জা ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। বলল 'কোথায় ছিলি যখন তোর স্বামী এতটুকু ছিল। ওর বড় দাদা একখানার বেশি দু'খানা কাপড় পরেনি। কীভাবে তাকে মানুষ করেছে। আজকে এরকম খোঁটা দিলি। এ অন্ন আমি আর স্পর্শ করব না। করলে যেন আমার ছেলের মরা মুখ দেখতে হয়।' শুনে বিন্দু মুর্ছা গেল। যা কোনদিন ভাবেনি, বলতেও চায়নি, রাগের মাথায় তা-ই বলে দিয়েছে। দেখালেন, রাগ control না করলে, যে কথা বলতে চাই না, যে কথা ভাবিও না, এমন কথাও অনেক সময় মুখে এসে যায়। সাময়িক হলেও পরিবারে ভাঙন নিয়ে আসে। এখানে আর একটা মূল্যবান জিনিস শরৎচন্দ্র এনেছেন, বিন্দুর ভাশুর মানে বড় জায়ের স্বামী তাঁর স্ত্রীকে বোঝাচ্ছেন, 'ক্ষমাই যদি করতে না পারলে তাহলে বড় হ'লে কেন?' এটা কিন্তু একটা মূল্যবান ethics, শরৎ সাহিত্যে এই ধরনের ethical কথা পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে। কত মূল্যবান নৈতিকতার কথা একটা ছোট্ট কথায় এনে দিলেন, ক্ষমাই যদি না করতে পারলে, তাহলে বড় হলে কেন? যে বড় সেই তো ক্ষমা করে।

প্রবল আঘাত, বিশেষত প্রিয়জনের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক আঘাত, সন্দেহ ও অবিশ্বাসজনিত ক্রোধ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে কত বড় সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়, এটাই শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীন'-এ কিরণময়ীর জীবন দিয়ে দেখালেন। কিরণময়ী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, স্বামীর কাছ থেকে দর্শনের শিক্ষা পেয়ে সুশিক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল গুরু-শিষ্যের, দাম্পত্য জীবনের প্রেম-ভালোবাসার লেশমাত্র ছিল না, শাশুড়ী ছিল কুটিল চরিত্রের, অত্যন্ত স্বার্থপর। তার কাছ থেকেও প্রহার ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই জুটতো না। সর্বদিক থেকে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত এই নারী ভালোবেসেছিল সৎ, হৃদয়বান, পরোপকারী, নির্লোভ, স্নেহপ্রবণ, তার স্বামীর বন্ধু উপেন্দ্রকে, সে বিবাহিত জেনেও। এটাও কিরণময়ী জেনেছিল উপেন্দ্রর কাছ থেকে পাবার কিছু নেই, কারণ সে তার স্ত্রী সুরবালাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। তার প্রতি কিরণময়ীর এই ভালোবাসা উপেন্দ্রর কাছে অস্বস্তিকর হলেও কিরণময়ীকে সে শ্রদ্ধা করত, বিশ্বাস করত। তাই সে তার

সন্তানতুল্য জ্ঞাতি ভাইকে মানুষ করার দায়িত্ব দিয়েছিল কিরণময়ীকে। কিরণময়ীও সানন্দে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল এবং পালন করেছিল। দিবাকর তার শূন্যজীবনে একটা অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দিবাকরও এই বৌদিকে মায়ের মতোই দেখত। কিরণময়ী তার দর্শন শাস্ত্রের নানা জ্ঞান, সাহিত্য নিয়ে বিভিন্ন মতামত, শিক্ষার্থী দিবাকরের কাছে উজাড় করে দিচ্ছিল, নানা গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টাও চলছিল। এই ভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল, দিবাকর খেয়াল করেনি যে তার কলেজে ভর্তি হওয়া ইতিমধ্যে বেশ কিছুদিন আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ উপেন্দ্র এসে এটা জানতে পেরে খুবই বিরক্ত হয়। কারণ জিজ্ঞাসা করায় কিরণময়ীর শাশুড়ী শয়তানী করে জানাল, কিরণময়ী ও দিবাকর দু'জন সোমত্ত ছেলেমেয়ে দিনরাত দরজা বন্ধ করে গল্পগুজব, ফিসফাস করে, এজন্যই দিবাকর ভর্তির তারিখ খেয়াল করেনি। ক্ষিপ্ত উপেন্দ্র এটা বিশ্বাস করল। কিরণময়ী যখন অন্যদিনের মতো তাকে খেতে দিল, ক্রুদ্ধ উপেন্দ্র বললো, "আপনার ছোঁয়া খাবার খেতে আজ আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে।" আহত কিরণময়ীও ক্ষিপ্ত হয়ে পাল্টা আঘাত দিয়ে জবাব দিল, "তোমার রাগ বল, ঘৃণা বল, ঠাকুরপো, সমস্ত দিবাকরকে নিয়ে ত? কিন্তু বিধবার কাছে সেও যা, তুমিও ত তাই। তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কতদূর গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা শুধু তোমাদের অনুমান মাত্র। কিন্তু সেদিন যখন নিজের মুখে তোমাকে ভালবাসা জানিয়েছিলুম, তখন ত আমার দেওয়া খাবারের থালাটা এমনি করে ঘৃণায় সরিয়ে রাখোনি। নিজের বেলা বুঝি কুলটার হাতের মিষ্টান্নে ভালবাসার মধু বেশী লাগে ঠাকুরপো।" উপেন্দ্র দুর্নিবার ক্রোধ সংবরণ করে বলল, "বৌঠান, স্মরণ করে দিচ্ছি যে, আজও আমার সুরবালা বেঁচে আছে। সে বলে, আমাকে যে ভালবেসেছে, তার সাধ্য নেই আর কাউকে ভালবাসে। এই ভরসাতেই শুধু দিবাকে আপনার হাতে সঁপে দিয়েছিলুম! ভেবেছিলুম এ-সব বিষয়ে সুরবালার কখনো ভুল হয় না।" কথাটা শেষ না হতেই কিরণময়ী দুই হাত তুলে বলল, "থামো ঠাকুরপো, তার ভুল হয়েছে, তোমার হয় নি, এ-কথা এমন অসংশয়ে তুমি কি করে বিশ্বাস করলে?" উপেন্দ্র হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "রাত হয়ে যাচ্ছে, আমার তর্ক করার সময় নেই। আমি আপনাকে চিনি। কিন্তু এই কথাটা নিশ্চয় জেনে রাখবেন যে, ভাল আপনি কাউকে বাসতে পারবেন না — সে সাধ্যই নেই আপনার। শুধু সর্বনাশই করতেই পারবেন। ছি ছি — শেষকালে কিনা দিবাটাকে—।" এ সব শুনে কিরণময়ীর সমস্ত মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, যেন কেউ তার বুকের মাঝখানে গুলি করেছে। ক্রুদ্ধ উপেন্দ্র সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অন্ধকারে পেছন থেকে তার চাদরে টান পড়ল, মুখ ফেরাতেই কিরণময়ী চক্ষের পলকে ঝুঁকে পড়ে দুই হাত দিয়ে তার পা চেপে ধরে বলল, "আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ঠাকুরপো, সমস্ত মিথ্যে! সমস্ত মিথ্যে! ছি, ছি, এত ছোট আমাকে তুমি পারলে ভাবতে!" "চুপ করুন, অনেক অভিনয় করেছেন — আর না।" একথা বলে উপেন্দ্র অসহ্য ঘৃণায় কিরণময়ীর মাথাটা সজোরে ঠেলে দিতেই সে পা ছেড়ে দিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল। সেদিকে না

তাকিয়ে "নাস্তিক, অপবিত্র, ভাইপার" এসব গালাগাল দিয়ে উপেন্দ্র দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। কিরণময়ী বিদ্যুৎবেগে উঠে বসল। কি যেন চিৎকার করে বলতে গেল, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না, শুধু উন্মুক্ত দরজার বাইরে অন্ধকারে চেয়ে থাকল এবং তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এরপরই অপমানিত, লাঞ্ছিত, প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ কিরণময়ী উন্মাদপ্রায় হয়ে দিবাকরকে ভালোবাসার অভিনয়ে বিভ্রান্ত করে একরকম জোর করে বাড়ির ঝি'র সাহায্য নিয়ে পরদিন ভোরে আরাকান যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে জাহাজে উঠল। ঝড়ে-জলে যখন জাহাজ ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল, তখন কিরণময়ী হঠাৎ দিবাকরকে বুকে টেনে চেপে ধরে বলল, "জাহাজ যদি ডোবে, আমরা যেন এমনি করেই মরি। তীরে ভেসে যাব, লোকে দেখবে, ছাপার কাগজে উঠবে, তোমার উপীনদাদা দেখবে — সে কেমন হবে ঠাকুরপো।" অর্থাৎ উপেন্দ্রকে কতটা আঘাত দেওয়া যাবে, এটাই তখন কিরণময়ী ভাবছে। প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উপেন্দ্রর উঁচু মাথাকে হেঁট করার জন্য কিরণময়ী দিবাকরের সাথে ভালোবাসার অভিনয় করে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে কখনও সেভাবে ভাবেনি, বরং ছোটভাইয়ের মতোই দেখত। প্রথম দিকে দিবাকরের সংকোচ, অস্বস্তি ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তার মধ্যে কিরণময়ীর প্রতি আকর্ষণ জন্মাতে শুরু করল, এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় কিরণময়ী বিস্মিত হল, দিবাকরের জাগ্রত ক্ষুধা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল এবং শেষপর্যন্ত দিবাকরকে অন্যত্র চলে যেতে বলল। ক্ষুব্ধ দিবাকর প্রশ্ন করল, "তা হলে আমার শুধু সর্বনাশ করার জন্যই এই বিপদে টেনে এনেছিলে? কোনদিন ভালও বাসনি?" কিরণময়ী বলল, "না, কিন্তু তোমার নয়, আর একজনের সর্বনাশ করছি ভেবেই তোমার ক্ষতি করেছি। আর আমার? যাক আমার কথা। সমস্তই আগাগোড়া ভুল হয়ে গেছে। আর, এই ভুলের জন্যই আজ তোমার পায়ে ধরে মাপ চাচ্ছি ঠাকুরপো।" এরপর ঐ উপন্যাসেরই আরেক চরিত্র, উপেন্দ্রর বিশ্বস্ত স্নেহের পাত্র এবং কিরণময়ীও যাকে ছোটভাইয়ের মতোই স্নেহ করে সেই সরল, সাহসী সতীশ অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে ক্ষত-বিক্ষত অনিচ্ছুক কিরণময়ী ও দিবাকরকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এল, কারণ মৃত্যুশয্যায় উপীন্দ্র তাদের দেখতে চেয়েছে। ওরা ফিরে গেল, কিন্তু উপেন্দ্রর এই অবস্থা দেখে কিরণময়ী যথার্থই পাগল হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র দেখালেন, কুচক্রী শয়তান শাশুড়ীর কথা অন্ধের মতো বিশ্বাস করে উপেন্দ্র যদি ক্ষিপ্ত হয়ে কিরণময়ীকে ওইভাবে অপমান ও আঘাত না করত, এবং তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে কিরণময়ী ওইভাবে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ না হত, তাহলে ওই মর্মান্তিক পরিণতি হত না।

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের সৃষ্টি। আধুনিক সাহিত্যের নামে সেই সময় একদল তরুণ লেখক ভালগারিজমের চর্চা শুরু করেছিল। তাদের সামনে আধুনিক সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত, তারই একটি দৃষ্টান্ত তিনি গাইড লাইন হিসাবে উপস্থিত করেছিলেন। জটিল দর্শন তত্ত্ব নিয়ে, অথচ শিল্পরস বজায় রেখে

লেখা এই ধরনের উপন্যাস বিশ্ব সাহিত্যে আর পাওয়া যায় না। এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্র দুটি, একদিকে প্রৌঢ় আশুবাবু, অন্যদিকে তরুণী কমল। আশুবাবু উচ্চশিক্ষিত, দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন, উদার, ভদ্র, কুসংস্কার মুক্ত, সহনশীল, স্নেহপরায়ণ কিন্তু ভারতের শাশ্বত ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। কমল প্রচলিত শিক্ষা না পেলেও যথেষ্ট শিক্ষিত, যুক্তিবাদী, বস্তুবাদ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় বিশ্বাসী, ঐতিহ্যবাদ ও শাশ্বত সত্যে অবিশ্বাসী, প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। সমগ্র উপন্যাসটি মূলত এই দু'জনের বিরোধী চিন্তায় বিতর্কবহুল, কিন্তু আশুবাবু কমলকে সন্তানতুল্য স্নেহ করেন, কমলও আশুবাবুকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করে।

প্রেমও যে শাশ্বত নয়, সেও যে পরিবর্তনশীল এটা বোঝাতে গিয়ে এই উপন্যাসের গোড়াতেই কমল বলছে, "একদিন যাকে ভালবেসেছি, কোন কারণেই আর তার পরিবর্তন হবার জো নেই, মনের এই অচল, অনড় জড়ধর্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।" আশুবাবু যৌবনেই স্ত্রীকে হারিয়েছেন, তাঁর এই পত্নী প্রেম অন্যদের কাছে শ্রদ্ধার বিষয়। কিন্তু কমল তাদের সাথে একমত নয়, কমল বলছে, "একদিন স্ত্রীকে আশুবাবু ভালবেসেছিলেন, কিন্তু তিনি আর বেঁচে নেই। তাঁকে দেবারও কিছু নেই, তাঁর কাছে পাবারও কিছু নেই। তাঁকে সুখী করাও যায় না, দুঃখ দেওয়াও যায় না। তিনি নেই। ভালবাসার পাত্র গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে, একদিন যে তাকে ভালবেসেছিলেন সেই ঘটনাটা কেবল মনে আছে। তাকেই মনের মধ্যে অহরহ পালন করে, বর্তমানের চেয়ে অতীতটাকে ধ্রুব জ্ঞানে জীবন-যাপন করার মধ্যে যে কি বড় আদর্শ আছে আমি ত ভেবে পাই নে।" এই কথায় আশুবাবু আঘাত পেয়ে বললেন, "কমল, কিন্তু আমাদের দেশের বিধবাদের হাতে ত শুধু এই জিনিসটাই থাকে চরম সম্বল। স্বামী যায়, কিন্তু তাঁর স্মৃতি নিয়েই ত বিধবার জীবনের পবিত্রতা অব্যাহত থাকে। এ কি তুমি মানো না?" কমল উত্তর দিল, "না। একটা বড় নাম দিলেই ত কোনও জিনিস সংসারে সত্যিই বড় হয়ে যায় না। বরং বলুন, এইভাবে এ দেশে বৈধব্য জীবন কাটানোই বিধি, বলুন, একটা মিথ্যেকে সত্যের গৌরব দিয়ে লোকে তাদের ঠকিয়ে আসচে — আমি, অস্বীকার করব না।"

আরেক জায়গায় আশুবাবু বলছেন, "দেখ, কমল, অপরের কথা বলতে চাই নে, কিন্তু আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য শুধু কথার কথা নয়। এ যাওয়া যে কত বড় ক্ষতি তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। কত ধর্ম, কত আদর্শ, কত পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, উপাখ্যান, শিল্প, কত অমূল্য সম্পদ এই বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করেই ত আজও জীবিত আছে।" কমল উত্তর দিল, "কোনও আদর্শই বহুকাল স্থায়ী হয়েছে বলেই, তা নিত্যকাল স্থায়ী হয় না এবং তার পরিবর্তনেও লজ্জা নেই, ...আতিথেয়তা আমাদের বড় আদর্শ। কত কাব্য, কত উপাখ্যান, কত কাহিনী এই নিয়ে রচিত হয়েছে। অতিথিকে খুশি করতে দাতাকর্ণ নিজের পুত্র হত্যা করেছিলেন। এই নিয়ে কত লোকে কত চোখের জলই যে ফেলেছে তার সংখ্যা নেই। অথচ এ কাহিনী আজ শুধু কুৎসিত নয়, বীভৎস। সতী স্ত্রী কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে কাঁধে নিয়ে গণিকালয়ে পৌঁছে

দিয়েছিল, — অতীতের এ আদর্শের একদিন তুলনা ছিল না, কিন্তু আজ সে কথা মানুষের মনে শুধু ঘৃণার উদ্রেক করে।” আশুবাবু কমল সম্পর্কে হরেন্দ্রকে বলছেন, “তোমরা জানই ত তাকে, প্রাচীন যা-কিছু তার ’পরেই তার প্রবল বিতৃষ্ণা। নাড়া দিয়ে ভেঙে ফেলাই যেন তার প্যাশন। মন সায় দিতে চায় না, চিরদিনের সংস্কার ভয়ে কাঠ হয়ে ওঠে, তবু কথা খুঁজে মেলে না, পরাভব মানতে হয়। মনে আছে সেদিনও তার কাছে মেয়েদের আত্মোৎসর্গের উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু কমল স্বীকার করলে না, বললে, মেয়েদের কথা আপনার চেয়ে আমি বেশি জানি। প্রবৃত্তি ত পূর্ণতা থেকে আসে না, আসে শুধু অপূর্ণতা থেকে, — ওঠে বুক খালি করে দিয়ে। ওতো স্বভাব নয় — অভাব। ... সহমরণের কথাও আপনার মনে পড়া উচিত। যারা পুড়ে মরত এবং তাদের যারা প্রবৃত্তি দিত, দু’পক্ষের দম্ভই ত সেদিন এই ভেবে আকাশে গিয়ে ঠেকত যে, বৈধব্য জীবনের এত বড় আদর্শের দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কোথায়?... এই আত্মোৎসর্গ কথাটার একটু বহুব্যাপ্ত ও বহুপ্রাচীন পারমার্থিক মোহ আছে, তাতে নেশা লাগে, পরলোকের অসামান্য-অবস্তু ইহলোকের সঙ্কীর্ণ সামান্য বস্তুকে সমাচ্ছন্ন করে দেয়, ভাবতেই দেয় না ওর মাঝে নরনারী কারও জীবনেরই শ্রেয় আছে কি না”। ভারতীয় ঐতিহ্য, সনাতন আদর্শ, বৈধব্যের পবিত্রতার — এই সবের প্রভাব আজও যুক্তিরূপে, সংস্কার রূপে প্রবল শক্তিতে রয়ে গেছে, অথচ সেই সময়ে শরৎচন্দ্র এইসব প্রাচীন চিন্তার বিরুদ্ধে কীভাবে লড়েছেন, আপনারা দেখছেন। যেমন, তিনি সেই সময়েই লক্ষ করেছেন সতীত্ব ও সতীদাহের উন্মাদনা কীভাবে সামাজিক মননে, নারীর মননে রয়ে গেছে, যেটা আজও বাস্তব। তিনি ঐ উপন্যাসেই কমল কণ্ঠে লিখছেন, “সতীদাহের বাইরের চেহারাটা রাজ শাসনে বদলালো, কিন্তু তার ভিতরের দাহ আজও তেমনি জ্বলছে, তেমনি করেই ছাই করে আনচে। এ নিভবে কি দিয়ে?” এসব প্রথার প্রতি অন্ধ আকর্ষণ থেকে মুক্ত করার জন্য পুরুষ শাসিত সমাজের ধর্মীয় সংস্কার ও বিধানের বিরুদ্ধে সামাজিক মনন মুক্ত করার জন্য যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রয়োজন ছিল, সেদিন যেমন হয়নি, বর্তমানেও হয়নি। ফলে বাইরে বন্ধ হলেও বদ্ধমূল সংস্কার মানুষের মনে, নারী জাতির মনে, মজ্জায়-রক্তে মিশে আছে।

‘শেষ প্রশ্ন’ বইতে কমল বলছে, “কোন দেশের বৈশিষ্ট্যের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই তার আদর। আসল কথা বর্তমান কালে সে বৈশিষ্ট্য মানুষের পক্ষে কল্যাণকর কিনা। এছাড়া সমস্ত শুধু অন্ধ মোহ। মানুষের চেয়ে মানুষের বিশেষত্বটাই বড় নয়। আর তাই যখন ভুলি বিশেষত্বও যায় মানুষকেও হারাই।” অর্থাৎ একেকটা দেশে একেক যুগে সেই যুগের প্রয়োজনে বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে, যুগের পরিবর্তনে সেটাও পাল্টায়। এটা না মানলে বিশেষত্বেরও মূল্য থাকে না, মানুষেরও ক্ষতি হয়। আর একটা অসাধারণ কথা কমলকে দিয়ে তিনি বলিয়েছেন, “বিশেষ কোন একটা দেশে জন্মেছি বলে তারই নিজস্ব আচার আচরণ চিরদিন আঁকড়ে থাকতে হবে কেন? গেলই বা তার বিশেষত্ব নিঃশেষ হয়ে। এতই কি

মমতা! বিশ্বের সকল মানব যদি একই চিন্তা একই ভাব একই বিধি-নিষেধের ধ্বজা বয়ে দাঁড়ায় কি তাতে ক্ষতি? ভারতীয় বলে চেনা যাবে না এইতো ভয়? নাই বা গেল চেনা? বিশ্বের মানব জাতির একজন বলে পরিচয় দিতে তো কেউ বাধা দেবে না। তার গৌরবই কি কম।" এক অসাধারণ কথা। এই কথা, আমরা যারা সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার জন্য লড়ছি তাদের বক্তব্যের কাছাকাছি। ইতিপূর্বে দুনিয়ায় কোন মানবতাবাদী সাহিত্যিক এই ধরনের অতি উন্নত চিন্তা ব্যক্ত করেছেন বলে আমার জানা নেই।

সেই যুগেই আশ্রম জীবন, ব্রহ্মচারী জীবনের সংযম — এগুলি সম্পর্কে অন্ধ ভক্তি ও আবেগকে fight করে শেষ প্রশ্নে শরৎচন্দ্র কমলের কণ্ঠে বলছেন, "আশ্রমের ফিলজফি আমি বুঝিনে, কিন্তু এটা বুঝি, দৈন্য-ভোগের বিড়ম্বনা দিয়ে কখনো বৃহৎকে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় শুধু খানিকটা দম্ভ আর অহমিকা।" আরেক জায়গায় আশ্রম জীবন ও ত্যাগের সাধনার পক্ষে যখন সতীশ বলল, "দেশের মুক্তি সংগ্রামে কি ধর্মের সাধনা ত্যাগের দীক্ষা প্রয়োজনীয় নয় আপনি বলেন?" কমল বলল, "মুক্তি সংগ্রামের অর্থটা আগে পরিষ্কার হোক।" সতীশ ইতস্তত করতে লাগল, কমল হেসে বলল, "ভাবে বোধহয় আপনি বিদেশি রাজশক্তির বন্ধন মোচনকেই দেশের মুক্তি সংগ্রাম বলছেন। তা যদি হয় সতীশ বাবু, অমি নিজে তো ধর্মের সাধনাও করিনি, ত্যাগের দীক্ষাও নিইনি, তবুও আমাকে আপনি ঠিক সামনের দলেই পাবেন এ আপনাকে আমি কথা দিলাম। কিন্তু আপনাদের খুঁজে পাব তো?" আরও বলল, "সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্য সাধনা আমাদের নয়, আমাদের সাধনা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা। কিন্তু তার শিক্ষা কি ছেলেদের এই? গায়ে একটা মোটা জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, পরণে জীর্ণ বস্ত্র, মাথায় রুক্ষ কেশ, একবেলা অর্ধাশনে যারা কেবল অস্বীকারের মধ্য দিয়েই বড় হয়ে উঠচে, পাওয়ার আনন্দ যার নিজের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, দেশের লক্ষ্মী কি পাঠিয়ে দেবেন শেষে তাদের হাত দিয়েই তার ভাঁড়ারের চাবি?" আশুবাবু এক জায়গায় রিপুর আক্রমণ সম্পর্কে বলছেন, "... ও যে রিপু, ওকে তো মানুষের জয় করা চাই।" কমল বলল, "কিন্তু রিপু বলে গাল দিলেই ত সে ছোট হয়ে যাবে না। প্রকৃতির পাকা দলিলে সে দখলদার— তাদের কোন সত্ত্বাটা কে কবে বিদ্রোহ করেই সংসারে ওড়াতে পেরেছে? দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যা করাই তো দুঃখকে জয় করা নয়।" এরপর এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রাখলেন শরৎবাবু। জোর করে sexকে repress করলে আধ্যাত্মিক চর্চাও যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, নানা বাজে ঝোঁক দেখা দেয়, তার ইঙ্গিত দিয়ে কমল বলল, "সমস্ত সংযমের মত যৌন সংযমেও সত্য আছে। কিন্তু সে গৌণ সত্য। ঘটা করে তাকে জীবনের মুখ্য সত্য করে তুললে সে হয় আর এক ধরনের অসংযম। তার দন্ড আছে। আত্মনিগ্রহের উগ্র দম্ভে আধ্যাত্মিকতা ক্ষীণ হয়ে আসে।" এই প্রশ্নে কমল আরেক জায়গায় বলছে, "সীমা মেনে চলাটাই তো সংযম, — শক্তির স্পর্ধায়

সংযমের সীমাকেও ডিঙ্গিয়ে যাওয়া সম্ভব। তখন আর তাকে সে মর্যাদা দেওয়া চলে না। অতি সংযম সে আর এক ধরনের অসংযম।" আশুবাবু উত্তরে বললেন, "....ও কেবল তোমার কথার ভোজবাজি। সেই ভোগের ওকালতিতেই পরিপূর্ণ।... তাতে ভোগের ক্ষুধাও মেটে না, অতৃপ্তি নিরন্তর বেড়েই চলে। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন, ও পথে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, মুক্তির আশা বৃথা।" শুনে হেসে উঠে কমল বললে, "শাস্ত্রে ঐ রকম আছে নাকি? থাকবেই ত। তাঁরা জানতেন, জ্ঞানের চর্চায় জ্ঞানের ইচ্ছে বাড়ে...." আশুবাবু বললেন, "না, এ তাঁদের অভিপ্রায় নয়, ভোগের মধ্যে তৃপ্তি নেই, কামনার নিবৃত্তি হয় না, এই ইঙ্গিতই তাঁরা করে গেছেন।" কমল একটুখানি থেমে বললে, "কি জানি, এমন বাহুল্য ইঙ্গিত তাঁরা কেন করে গেলেন। এ কি হাটের মাঝখানে বসে যাত্রা শোনা, না প্রতিবেশীর গৃহের গ্রামোফোনের বাজনা যে, মাঝখানেই মনে হবে, থাক, যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করা গেছে, আর না। এর আসল সত্ত্বা ত বাইরের ভোগের মধ্যে নেই — উৎস ওর জীবনের মূলে, ঐখান থেকে ও নিত্যকাল জীবনের আশা, আনন্দ ও রসের যোগান দেয়। শাস্ত্রের ধিক্কার ব্যর্থ হয়ে দরজায় পড়ে থাকে, তাকে স্পর্শ করতেও পারে না।" একবার ভেবে দেখুন, এই ধরনের অতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা আর কোন সাহিত্যিক বা চিন্তাবিদ সেই সময়ে বলেছেন?

শেষ প্রশ্নে কমলের মুখ দিয়ে আরেকটা মূল্যবান শিক্ষাও তিনি বলেছেন। বলেছেন, "মন্দ ত ভালর শত্রু নয়, ভালর শত্রু তার চেয়েও আরও ভাল, — সে।" এর দ্বারা তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, সমাজ জীবনে সবকিছুই —অর্থনীতি, রাজনীতি, নীতি-আদর্শ, সংস্কৃতি, ন্যায়নীতি নিয়ত পরিবর্তনশীল, এক যুগে যা প্রগতিশীল, কল্যাণ কর, গতির পথে তা প্রতিক্রিয়াশীল অকল্যাণকর ও ক্ষতিকারক হয়ে যায়, তখনই আসে আরও উন্নততর সবকিছু, ফলে এক যুগে ভালো হিসাবে যে এসেছিল, তাকে চলে যেতে হয়, তার চেয়েও উন্নততর ভালোকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে। এই অর্থেই 'ভালর শত্রু তার চেয়েও আরও ভাল।' মন্দ এসে কিছুদিনের জন্য ক্ষতি করে মাত্র, শেষ পর্যন্ত ভালই জয়যুক্ত হয়, এই অর্থে 'মন্দ ত ভালর শত্রু নয়।'

আরেকটা মূল্যবান শিক্ষা হিসাবে শেষ প্রশ্নে বলেছেন, "মানুষের দুঃখটাই যদি দুঃখ পাওয়ার শেষ কথা হতো, তার মূল্য ছিল না। সে একদিকের ক্ষতি আর একদিকের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে পূর্ণ করে তোলে"। অনেকেই দুঃখে, আঘাতে মুষড়ে পড়ে, ভেঙ্গে পড়ে, ভাবে সব শেষ হয়ে গেল। আর শরৎচন্দ্র বলছেন, এই দুঃখ ও আঘাতের মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা আসে, জ্ঞান আসে, দুঃখ সহ্য করার শক্তি আসে, সেটা 'মস্ত সঞ্চয়' হয়ে যায়, পরিণামে সেই ব্যক্তি উপকৃতও হয়।

জীবনে কোনও প্রশ্নই যে শেষ নয়, এরপর আর কিছু ঘটতে পারে না — এ ভাবে ভাবা যে চলে না, এটাও এই 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে তিনি দেখালেন। যে আশুবাবু যৌবনেই স্ত্রীকে হারিয়েছেন, প্রয়াত স্ত্রীর প্রতি তাঁর প্রেমের স্মৃতি আজও

উজ্জ্বল হয়ে আছে, এ-জীবনে আর কারও কথা ভাবতেই পারেননি এবং তিনি শাশ্বত প্রেমে বিশ্বাসী। সেই আশুবাবুর জীবনেও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধ বয়সে যুবতী নারীর ভালোবাসা এল। অবিনাশের শ্যালিকা নীলিমা ভদ্র, পরিচ্ছন্ন মনের, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও সেবা পরায়ণ। অসুস্থ অক্ষম আশুবাবুকে দেখভালের জন্যই এসেছিল এবং খুবই যত্ন করেছিল। এর বাইরে কোনও কিছুই কারও ভাবনার মধ্যেও ছিল না। সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে বোঝা গেল তার feeling। আশুবাবু আবার বিদেশ যাবেন, যাবার আগে কলকাতায় তাঁর কর্মচারীকে লেখা চিঠি নীলিমাকে শোনাচ্ছিলেন। সে সেলাই করছিল। কিছুক্ষণ পর সাড়াশব্দ না পেয়ে তাকিয়ে দেখলেন, নীলিমা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, কোনওক্রমে তার মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে সে শশব্যস্তে উঠে বসল, তার দেহটা কেঁপে উঠল, তারপর উপুড় হয়ে আশুবাবুর কোলের ওপর মুখ চেপে হু হু করে কেঁদে উঠল, যেন তার বুক ফেটে যাচ্ছে। দু-এক মিনিট পরেই নীলিমা তীরের মত উঠে দাঁড়াল, আর ফিরে চাইল না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আশুবাবুর সাথে আর দেখা করল না। এ কাহিনী বর্ণনা করে বিস্মিত আশুবাবু কমলকে বলছেন, "আর কেউ হলে সন্দেহ হত এ শুধু ছলনা — শুধু স্বার্থ। কিন্তু এর সম্বন্ধে এমন কথা ভাবাও অপরাধ। এ কি আশ্চর্য মেয়েদের মন।" তারপর নিজের সম্পর্কে বলছেন, "এই রোগাতুর জীর্ণদেহ, এই অক্ষম অবসন্ন চিত্ত, এই জীবনের অপরাহ্ন বেলায় জীবনের দাম যার কানাকড়িও নয়, তারও প্রতি যে সুন্দরী যুবতী মন আকৃষ্ট হতে পারে, এতবড় বিস্ময় জগতে কি আছে! অথচ, এ সত্য, এর একটুকু মিথ্যে নয়।... কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই বুদ্ধিমতী নারী আমার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করে না। ও শুধু চায় আমাকে যত্ন করতে, শুধু চায় সেবার অভাবে জীবনের নিঃসঙ্গ বাকি দিন-কটা যেন না আমার দুঃখে শেষ হয়। ...এই দুটো দিন আমি দু'শো বছরের ভাবনা ভেবেছি কমল। স্ত্রীর ভালবাসা আমি পেয়েছিলাম, তার স্বাদ চিনি, স্বরূপ জানি, কিন্তু নারীর ভালবাসার সে কেবল একটিমাত্র দিক, — এই নতুন তত্ত্বটি আমাকে যেন হঠাৎ আচ্ছন্ন করেছে। এর কত বাধা, কত ব্যথা, আপনাকে বিসর্জন দেবার কতই না অজানা আয়োজন। হাত পেতে নিতে পারলাম না বটে, কিন্তু কি বলে যে একে আজ নমস্কার জানাব আমি ভেবেই পাইনে, মা।" এভাবে আশুবাবুর জীবনের এই নতুন সমস্যা এনে দেখিয়ে দিলেন শরৎচন্দ্র, পূর্বের চিন্তা কত ভ্রান্ত! জীবনে শেষ প্রশ্ন বলে কিছু নেই। নতুন নতুন প্রশ্ন আসে, সমস্যা আসে, নতুন সমাধান খুঁজতে হয়। পরিবর্তনশীল জগতে এই নিয়ম।

এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র কমল, যে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করে, চিরন্তন ভালোবাসা বলে কিছু নেই, এক সময়ের ভালোবাসা মরে যেতে পারে, তাকে জীর্ণ বস্ত্রের মতোই পরিত্যাগ করতে হয়, আবার জীবনে নতুন করে সত্যিকারের ভালোবাসা দেখা দিলে তাকে সানন্দে বরণ করতে হয়। সেই কমলই দৃপ্তকণ্ঠে অজিতকে বলতে পারে "পুরুষের ভোগের বস্তু যারা, আমি সেই জাতের নই।"

আবার এই কমলই আশ্রমবাসী হরেন্দ্রকে বিশেষ কারণবশত এমন প্রস্তাব দিল, যা শুনে হরেন্দ্রও কাঁপতে শুরু করল। কমলের বাসায় হরেন্দ্র ও কমলের কথায় কথায় কারও খেয়াল ছিল না যে, অনেক রাত হয়ে গেছে, এত রাতে যানবাহন পাওয়া যাবে না। তাই কমল প্রস্তাব দিল, "হরেনবাবু, রাত্রি অনেক হ'লো, এখন আর বাসায় যাওয়া চলে না, — এই ঘরেই একটা বিছানা করে দিই?" হরেন্দ্র বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এই ঘরে? কিন্তু আপনি?" কমল বলল, "আমিও এইখানেই শোব। আর ত ঘর নেই।" হরেন্দ্র লজ্জায় পাংশু হয়ে উঠল। কমল হেসে বলল, 'আপনি ত ব্রহ্মচারী। আপনার ভয়ের কারণ আছে নাকি?' হরেন্দ্র শুধু নির্ণিমেষ চক্ষে চেয়ে রইল। স্ত্রীলোক হয়ে এ কথা সে উচ্চারণ করল কী করে! তার অপরিসীম বিহ্বলতা কমলকেও ধাক্কা দিল। সে কয়েক মুহূর্ত স্থির থেকে বলল, "আমারই ভুল হয়েছে হরেনবাবু, আপনি বাসায় যান। তাইতেই আপনার অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী নীলিমার আশ্রমে ঠাঁই মেলেনি, মিলেছিল আশুবাবুর বাড়ি। নির্জন গৃহে অনাত্মীয় নরনারীর একটিমাত্র সম্বন্ধই আপনি জানেন — পুরুষের কাছে মেয়েমানুষ যে শুধুই মেয়েমানুষ, এর বেশি খবর আপনার কাছে আজও পৌঁছায়নি। ব্রহ্মচারী হলেও না।" এই ঘটনা দিয়ে শরৎচন্দ্র কমলকে এক বলিষ্ঠ, দুঃসাহসী, তেজস্বী নারী হিসাবে যেমন দেখালেন, তেমনি ব্রহ্মচারী জীবনের অসারতাও প্রতিপন্ন করলেন। দেখালেন, নির্জনগৃহে নারীর সাথে থাকলে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা কঠিন হয়, তাই নারীর সংস্পর্শ থেকে পালাতে হয়।

শরৎচন্দ্র দেখালেন এই বলিষ্ঠ নারী চরিত্রও প্রবল ধাক্কা খেল আরেকটি স্বল্প পরিসরের চরিত্র রাজেনের কাছে। কমল রাজেনকে বলল, "লোকে বলে তুমি বিপ্লবপন্থী, তা যদি সত্য হয় আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব তোমার অক্ষয় হবে"। রাজেন প্রশ্ন করল, "এই অক্ষয় - বন্ধুত্ব আমার কি কাজে লাগবে?" এতে কমল বিস্মিত হল, ব্যথিত হল। একটা সংশয় ও উপেক্ষার সুস্পষ্ট সুর তার কানে বাজল, সে উত্তর দিল, "...বন্ধুত্ব বস্তুটা সংসারে দুর্লভ, আর আমার বন্ধুত্ব তার চেয়েও দুর্লভ। যাকে চেনো না তাকে অশ্রদ্ধা করে নিজেকে খাটো করো না।" রাজেন হাসিমুখে সহজেই উত্তর দিল, "অশ্রদ্ধার জন্য নয়, বন্ধুত্বের প্রয়োজন বুঝিনে, তাই শুধু জানিয়েছিলাম। আর যদি মনে করেন এ বস্তু আমার কাজে লাগবে, আমি অস্বীকার করব না..." শরৎচন্দ্র দেখাচ্ছেন, এই উত্তরে "কমলের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কে যেন তাহাকে চাবুকের বাড়ি মারিয়া অপমান করিল। সে অতি শিক্ষিতা, অতি সুন্দরী, ও প্রখর বুদ্ধিশালিনী, সে পুরুষের কামনার ধন, এই ছিল তাহার ধারণা, তাহার দৃপ্ত তেজ অপরাজেয়, ইহাই ছিল অকপট বিশ্বাস। সংসারে নারী তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে, পুরুষ আতঙ্কে আগুন জ্বালিয়া দগ্ধ করিতে চাহিয়াছে, অবহেলার ভান করে নাই তাহাও নয়, কিন্তু এ সে নয়। আজ এই লোকটির কাছে যেন সে তুচ্ছতায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। ...কমলের একটা সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, আমার সম্বন্ধে তুমি বোধ হয় অনেক কথাই শুনেছ? রাজেন বলিল, ওঁরা প্রায়ই

বলেন বটে। কমল প্রশ্ন করিল, কি বলেন? রাজেন একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, দেখুন এ সব ব্যাপারে আমার স্মরণ-শক্তি বড় খারাপ। কিছুই প্রায় মনে নেই। কমল জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি বলছ? রাজেন উত্তর দিল, সত্যিই বলছি। কমল জেরা করিল না। বিশ্বাস করিল। বুঝিল স্ত্রীলোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এই মানুষটির আজও কোন কৌতূহল জাগে নাই। সে যেমন শুনিয়াছে তেমনি ভুলিয়াছে। আরও একটা জিনিস বুঝিল। 'তুমি' বলিবার অধিকার দেওয়া সত্ত্বেও কেন সে গ্রহণ করে নাই, 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। তাহার অকলঙ্ক পুরুষ চিত্ততলে আজও নারীমূর্তির ছায়া পড়ে নাই — 'তুমি' বলিয়া ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার লুব্ধতা তাহার অপরিজ্ঞাত।" অথচ সে ব্রহ্মচারী নয়, আশ্রমের ঈশ্বর-তত্ত্বেও সে বিশ্বাস করে না। আশ্রমে পুলিশ তার খোঁজ করেছিল বলে আশ্রমের কর্তৃপক্ষ তাকে আশ্রম ছাড়তে বলে। কমল তাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ডেকেছিল। কিন্তু ধরে রাখতে পারেনি। এ নিয়ে কমল দুঃখ করে হরেন্দ্রকে বলছে, "রাজেনকে যে ভুলতে পারিনে — এ সবচেয়ে বেশি টের পাই আপনি এলে। তার আশ্রমে স্থান হলো না, কিন্তু গাছতলায় থাকলেও তার চলে যেতো। শুধু আমিই থাকতে দিইনি, আদর করে ডেকে এনেছিলাম। ঘরে এলো, কিন্তু কোথাও মন বাধা পেলে না। হাওয়া-আলোর মত সব দিক খালি পড়ে রইলো, পুরুষের যেন একটা নূতন পরিচয় পেলাম।"

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে বিপ্লবী রাজেন চরিত্র ক্ষুদ্র পরিসরের হলেও এক অত্যন্ত বিস্ময়কর সৃষ্টি। সেই সময়ের অধিকাংশ পেটিবুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত বিপ্লবীরা ব্রহ্মচারী জীবনকে আদর্শ গণ্য করে নারীদের বিপ্লবী আন্দোলনে আনতে চায়নি। এমনকী কিছুটা দূরে রাখারও চেষ্টা করেছে। রাজেন সে জাতের নয়, তাকে বাঁধতে পারে কোনও নারীর এমন সাধ্য নেই, আবার সে নারী থেকে দূরে থাকে না, ব্রহ্মচারীও নয়। আদর্শ বা তার কাজের প্রয়োজনে যদি কোনও নারীর সাথে তার বন্ধুত্বের বা সম্পর্কের প্রয়োজন থাকে, তাহলে সে গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া সাধারণ যুবকের মতো অন্য কোনও প্রয়োজন বা নিছক দৈহিক কারণে তার প্রয়োজন নেই। কোনও নারীর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার নেই, নারী সম্পর্কে কোনও কৌতূহলও নেই। অন্য কোনও ব্যক্তিগত প্রয়োজনও নেই, নরনারীর সম্পর্কের প্রশ্নে অনেকটা এ এক ইম্পার্সোনাল অ্যাপ্রোচ, এ যেন কমিউনিস্ট চরিত্রের কাছাকাছি। যদিও শরৎচন্দ্র মার্কসবাদী না হওয়ায় কী তার আদর্শ, কী তার মূল চরিত্রের রূপ সেটা অস্পষ্ট থেকে গেছে। সাহিত্যে এই ধরনের চরিত্র বিশ্বে আর দেখা গেছে বলে অন্তত আমার জানা নেই। এই উপন্যাসেই শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন বেলা প্রথাগত অর্থে সুশিক্ষিতা, স্বামী দুশ্চরিত্র বলে তার সাথে থাকে না, কিন্তু ভোগবিলাসের উপকরণের জন্য সেই স্বামীর কাছ থেকে টাকা নিতে তার আত্মসম্মানে লাগে না। বড় অফিসারদের গৃহিনী মালিনী, বেলারা কমলকে অবজ্ঞা করার ভান করেছে, কারণ কমলের কাছে এই সব

তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতা অতি আধুনিকারা দাঁড়াতে পারে না, কারণ ভয় পায়, যদি তারা অতি তুচ্ছ হয়ে যায়, তাই অবজ্ঞার ভান করে।

কমল এমনও বলছে, প্রেম না থাকলে অনুষ্ঠানের জোরে কোনও বিয়েই সার্থক হয় না। বিবাহিত জীবনের মূল ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, মমতা। এসব যেখানে নেই, সেখানে শুধু অনুষ্ঠানের জোরে বিয়ের সার্থকতা থাকে না। এটা live together তত্ত্ব নয়। Live together-এর ধারনায় শ্রদ্ধা, প্রেম এসব নেই, সেখানে নরনারী কেউ বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব নিতে চায় না, শুধু দৈহিক ভোগের প্রয়োজনে একত্রে থাকা। কমল বিবাহিত জীবনের সকল দায়িত্বই নিতে প্রস্তুত। দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এখানে মূল আকর্ষণ হচ্ছে শ্রদ্ধা, স্নেহ, মমতা। কমল শুধু দেখাতে চেয়েছে শ্রদ্ধা-ভালোবাসাহীন বিবাহিত জীবন প্রাণহীন দেহের মত। অনুষ্ঠান নয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসাই বিবাহিত সম্পর্কের প্রাণ। শরৎবাবু শেষ জীবনে 'শেষ প্রশ্ন' বইটি লিখেছিলেন বিশেষ কারণে। অতি আধুনিকতার নামে অশ্লীলতা চর্চায় উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি সাহিত্যে যথার্থ আধুনিকতা কী হওয়া উচিত তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন। তিনি দেখালেন, প্রাচীন ঐতিহ্যবাদকে ভেঙে বৈজ্ঞানিক, যুক্তিবাদী, গণতান্ত্রিক, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ার প্রচেষ্টাই সাহিত্যে যথার্থ আধুনিকতা।

সাহিত্যে অশ্লীলতার সূচনা দেখে তিনি আতঙ্কিত হয়েছিলেন। এইসব আধুনিক সাহিত্যিকদের উদ্দেশে বিভিন্ন ভাষণে বলেছিলেন, "আমি দেখছি, আমি যাকে রস বলে বুঝি, তাঁদের ভিতর তার বড্ড অভাব। ...একটা মানুষের হৃদয়বৃত্তির যত ভাগ আছে, তার একটা ভাগ যেন তাঁরা অনবরত পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন, সে যেন আর থামেনা। ...কেবল একটা ব্যাপারে তোমরা বেদনা বোধ করছ।... বেদনার কি আর কোন বস্তু দেখতে পাওনা। ...মানবজীবন, সমস্ত সংসার, এত বড় পরাধীন জাতি, এ সব ত রয়েছে, এর বেদনা কি তোমরা অনুভব কর না? ...এর অভাব, বেদনা কি তোমাদের লাগে না? এর জন্য প্রাণটা কাঁদে না কি? ...যেটাকে তোমরা সাহস মনে করছ, আমি মনে করি সেটা সাহসের অভাব।[৯] ...এই সত্যটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্য রচনায় আর যাই না কেন হোক শ্লীলতা, শোভনতা, ভদ্ররুচি, মার্জিত মনের রসোপলব্ধিকে অকারণ দাম্ভিকতায় বারম্বার আঘাত করতে থাকলে বাংলা সাহিত্যের যত ক্ষতিই হোক, তাঁদের নিজেদের ক্ষতি হবে তার চেয়েও অনেক বেশি। সে আত্মহত্যারই নামান্তর।[১০] ... Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে, — তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা ফটোগ্রাফি হতে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষক ভয়ানক ঘটনা ছাপা হয়ে থাকে, সে কি সাহিত্য?[১১] ... নর-নারীর যৌন মিলন সকল রস-সাহিত্যের ভিত্তি, ...ভিত্তির মত ও-বস্তুটি সাহিত্যের গভীর ও গোপন অংশেই থাক। বনিয়াদ যত নীচে এবং যতই প্রচ্ছন্ন থাকে অট্টালিকা ততই সুদৃঢ় হয়। ততই শিল্পীর ইচ্ছামত

তাহাতে কারুকার্য রচনা করা চলে। গাছের শিকড় গাছের জীবন ও ফুল-ফলের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়ই হউক — তাহাকে খুঁড়িয়া উপরে তুলিলে তাহার সৌন্দর্যও যায়, প্রাণও শুকায়।"[৬] শরৎবাবু বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দিলীপ রায়কে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, "শেষ প্রশ্নে অতি আধুনিক সাহিত্য কিরকম হওয়া উচিত তাকেই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেছি। 'খুব করবো, গর্জন করে নোংরা কথাই লিখবো' এই মনোভাবটাই অতি আধুনিক সাহিত্যের সেন্ট্রাল পিভট নয় — এরই একটু নমুনা দেওয়া।"

এবার নারীমুক্তির প্রশ্নে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল সেটা বোঝাবার জন্য তাঁর কয়েকটি মূল্যবান বক্তব্য আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। তিনি এক জায়গায় ধর্মীয় বিচারের সমালোচনা করে বলছেন, "যে ধর্ম বনিয়াদ গড়িয়াছে আদিম জননী ইভ-এর পাপের উপর, যে ধর্ম সংসারের সমস্ত অধঃপতনের মূলে নারীকে বসাইয়া দিয়াছে, সে ধর্ম সত্য বলিয়া যে কেহ অন্তরের মধ্যে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার সাধ্য নয় নারীজাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে।"[১২] আর এক জায়গায় বলছেন, "কোন একটা বিশেষ নিয়ম যখন দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহা যে একদিনেই হইয়া যায় তাহা নহে, ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইতে থাকে। যাহারা সম্পন্ন করেন, তাহারা পুরুষের অধিকার লইয়া করেন। তখন তাহারা পুরুষ — পিতা নন, ভ্রাতা নন, স্বামী নন।.... নারীর নিকট হইতে কতখানি কিভাবে আদায় করিয়া লইবে, সেই উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে, তারপর মনু আসেন, পরাশর আসেন, মোজেস আসেন, পল আসেন, শ্লোক বাঁধেন, শাস্ত্র তৈয়ার করেন, — স্বার্থ তখন ধর্ম হইয়া সুদৃঢ় হস্তে শাসন করিবার অধিকার লাভ করে।"[১২] যারা কুল ত্যাগ করে, তারা কেন করে এই সম্পর্কে একটা চিঠিতে লিখছেন, "আমি নিজে একবার ছয় সাত শত কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলাম ...দুর্নামে দেশ ভরে গেল সত্যি, কিন্তু এই কথাটা নিঃশেষে জানতে পারলাম, যারা কুলত্যাগ করে আসে তাদের শতকরা প্রায় আশিজন সধবা, বিধবা খুব কম। ...অনেক দুঃখে মেয়েমানুষ নিজের ধর্ম নষ্ট করতে রাজি হয়। পরপুরুষের রূপেও নয়, একটা বীভৎস প্রবৃত্তির লোভেও নয়। তারা এতবড় জিনিসটা যখন নিজে নষ্ট করে তখন বাইরে গিয়ে কিছু একটা আশ্চর্য বস্তু পাবার লোভে নয়।" ইলাচন্দ্র যোশীর চিঠির উত্তরে শরৎচন্দ্র লিখছেন, "এমন অনেক নারীকে আমি জানি, পরপুরুষের সঙ্গে যাদের কোনদিন শারীরিক বা মানসিক সম্পর্ক ঘটেনি। তবুও তাদের স্বভাবে অত্যন্ত নীচতা, ঘোর সঙ্কীর্ণতা, বিদ্বেষ, এবং চৌর্যবৃত্তি দেখা যায়। আবার ঠিক এর উল্টো এমন পতিতা মেয়েদের আমি জানি, যাদের মনে মাতৃহৃদয়ের নিঃস্বার্থ মমতা এবং করুণার ধারা অজস্র ধারায় উপচে পড়ছে।" এইজন্যই শরৎচন্দ্র বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন, "পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব, সতীত্বের চেয়ে বড়"[৪] এবং "মানব ধর্মকে আমি সতীধর্মের চেয়ে বড় বলে মনে করি। সতীত্ব ও নারীত্ব এই দুটি আদর্শও এক নয়।"[১৩] পুরুষশাসিত সমাজের চোখে নারীত্বের মূল্য কি, এই প্রশ্নে শরৎচন্দ্র সমাজকে তীব্র কষাঘাত করে নারীর মূল্য প্রবন্ধে

লিখেছেন, "নারীত্বের মূল্য কি? অর্থাৎ, কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখ কষ্টে মৌনা। অর্থাৎ তাঁহাকে লইয়া কি পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে। এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী! অর্থাৎ পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবেন। দাম কষিবার এ ছাড়া যে আর কোন পথ নাই, সে কথা আমি পৃথিবীর ইতিহাস খুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।"

যুগ যুগ ধরে নারীদের শিক্ষা দেওয়া হয় যে, বিবাহিত জীবনই তাদের জীবনের সর্বস্ব, এ না হলে জীবনের সব কিছু চলে গেল। পুরুষদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা বলা হয় না। অথচ বিবাহিত জীবন পুরুষ ও নারী সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু কারোরই এটা জীবনের সর্বস্ব হতে পারে না। আরেকটা কথাও নারীদের রক্ত-মাংস-মজ্জায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মাতৃত্বই নারী জীবনের চরম সার্থকতা এবং তাও আবার পুরুষশাসিত সমাজের বিধান অনুযায়ী পুত্র সন্তানের জননী হতে পারাটাই গৌরবের। একজন নারী শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ — যাই হোন না কেন, তাঁর জীবনের সর্বস্ব হচ্ছে বিবাহ এবং চরম সার্থকতা হচ্ছে মাতৃত্ব। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে এটা নেই। শত শত বৎসর ধরে প্রচারিত এই মিথ্যা চিন্তা থেকে নারীকে মোহমুক্ত করার জন্য শরৎচন্দ্র 'শেষ প্রশ্নে' লিখছেন, "সংসারের অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহটাও একটা ঘটনা — তার বেশি নয়, ওটাকেই নারীর সর্বস্ব বলে যেদিন থেকে মেনে নিয়েছেন, সেইদিনই শুরু হয়েছে মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।.... চাটুবাক্যের নানা অলঙ্কার গায়ে পরিয়ে দিয়ে যারা প্রচার করেছিল মাতৃত্বই নারীর চরম সার্থকতা, সমস্ত নারীজাতিকে তারা বঞ্চনা করেছিল। ....যারা ঘোষণা করেছিল, পুত্রের জন্যই ভার্যার প্রয়োজন, তারা মেয়েদের শুধু অপমান করেই ক্ষান্ত হয়নি, নিজেদের বড় হবার পথটাও বন্ধ করেছিল।" এভাবে নারীর প্রতি চরম বঞ্চনা ও অপমানের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে বিশ্ব সাহিত্যে আর কেউ বলেছেন বলে আমার জানা নেই। নারীদের প্রত্যক্ষ রাজনীতি করা সেই যুগে অনেকেই সমর্থন করতেন না। শরৎচন্দ্র এই চিন্তার বিরোধিতা করে লিখছেন, "রাষ্ট্রীয় সাধনাতে নারীকেও নামতে হবে— দেশের স্বাধীনতার জন্য নারী পুরুষের সম্মিলিত সাধনা চাই, তা নইলে কিছু হবে না। আমি জানি ছেলেরা ও মেয়েরা যদি এক সঙ্গে কাজে নামে, তাহলে দেশের লোক নানারকম কুৎসা রটাবেই — তা রটাক। নিন্দুক তার কাজ করবেই, কিন্তু তাই বলে কি আমরা কাজ বন্ধ রাখবো? দেশের জন্যে যে সুনামের প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করতে পারবে না, তার আবার ত্যাগ কোথায়?"[১৪] আরেক জায়গায় একই কথা অন্যভাবে বলছেন, "যে চেষ্টায়, যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি কবার কোনো জ্ঞান, কোনো শিক্ষা, কোনো সাহস আজ পর্যন্ত যাদের দিইনি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে, শুধুমাত্র চরকা কাটতে বাধ্য করেই এতবড় বস্তু লাভ করা যাবে না। মেয়েমানুষকে

আমরা যেমন মেয়ে করেই রেখেছি, মানুষ হতে দিইনি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই।"[১৫]

শরৎচন্দ্র নিজে কত উন্নত স্তরের এথিক্সের চর্চা করতেন, তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাই। সাধারণত কি হয়, কেউ আমাদের নিন্দা বা কটু সমালোচনা করলে, আমরা ক্ষিপ্ত হয়ে যাই। কিন্তু আমাদের সমর্থনে কেউ বললে, সে বলার ঢং ঠিক না হলেও আমরা সন্তুষ্ট হই, তাদের বলাটাকে প্রশ্রয় দিই। অথচ শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণই করেছেন। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস প্রকাশ হওয়ার পর প্রবল ঝড় ওঠে, একদল তীব্র ভাষায় শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করেন। এই পরিস্থিতিতে এক মহিলা শরৎচন্দ্রকে যে চিঠি লেখেন, তার যে উত্তর তিনি দিয়েছিলেন সেটা আমাদের কাছে অত্যন্ত শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। আরও কেউ কেউ শরৎচন্দ্রকে এ ধরনের চিঠি লিখেছেন, প্রথমে তাদেরকেও সূক্ষ্ম রসের ভাষায় তীব্র সমালোচনা করে তিনি এই উত্তরে লেখেন, "হ্যাঁ, 'শেষ প্রশ্ন' নিয়ে আন্দোলনের ঢেউ আমার কানে এসে পৌঁছেছে। অন্ততঃ যেগুলি অতিশয় তীব্র ও কটু, সেগুলি যেন না দৈবাৎ আমার চোখ কান এড়িয়ে যায়, যাঁরা অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী তাঁদের সেদিকে প্রখর দৃষ্টি। লেখাগুলি সযত্নে সংগ্রহ করে লাল-নীল-সবুজ-বেগুনী নানা রঙের পেন্সিলে দাগ দিয়ে, তাঁরা ডাকের মাশুল দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবং পরে আলাদা চিঠি লিখে খবর নিয়েছেন পৌঁছাল কিনা। তাঁদের আগ্রহ, ক্রোধ ও সমবেদনা হৃদয় স্পর্শ করে।" তারপর সেই মহিলাকে লিখছেন, "নিজে তুমি কাগজ পাঠাওনি বটে, কিন্তু তাই বলে রাগও কম করোনি। সমালোচকদের চরিত্র, রুচি, এমনকি পারিবারিক জীবনকেও কটাক্ষ করেছো। একবারও ভেবে দেখো নি যে, শক্ত কথা বলতে পারাটাই সংসারে শক্ত কাজ নয়। মানুষকে অপমান করায় নিজের মর্যাদাই আহত হয় সবচেয়ে বেশি। জীবনে এ যারা ভোলে তারা একটা বড় কথাই ভুলে থাকে। তা ছাড়া এমন ত হতে পারে, 'শেষ প্রশ্ন' এদের সত্যিই খারাপ লেগেছে। ...মনের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও যে ভদ্রব্যক্তির অসংযত ভাষা প্রয়োগ করা চলে না, এই কথাটাই অনেক দিনে অনেক দুঃখে আয়ত্ত করতে হয়। তোমার চিঠির মধ্যে এ ভুল তুমি তাঁদের চেয়েও করেছো। এতবড় আত্ম-অবমাননা আর নেই। ...জানতে চেয়েছো আমি এ সকলের জবাব দিইনি কেন? এর উত্তর — আমার ইচ্ছা করে না, কারণ ও আমার কাজ নয়।" তারপরই লিখছেন, "আত্মরক্ষার ছলেও মানুষের অসম্মান করা আমার ধাতে পোষায় না।"[১৬] একবার ভাবুন তো কতবড় উন্নত ethics-এর পরিচয় তিনি দিলেন, যেটা আমাদের কাছেও কত শিক্ষণীয়! Ethics বিষয়ে আরেকটি মূল্যবান শিক্ষা শরৎচন্দ্র নারীর মূল্য প্রবন্ধে লিখেছেন। তিনি বলেছেন, "ইংরাজীতে যাহাকে ethics বলে, তাহার একটা গোড়ার কথা এই যে, ...আমার স্বাধীনতাটা কেবল ততদূর পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে পারি যতক্ষণ না তাহা আর একজনের তুল্য স্বাধীনতায় আঘাত করে।"

এই শরৎচন্দ্রই দেখিয়েছেন যথার্থ ভালোবাসা বিচারের মাপকাঠি কি হবে। এটা এখনকার আমাদের ছেলেমেয়েদের খুব ভালো করে বোঝা দরকার। রাধারানী দেবীকে লেখা একটা চিঠিতে তিনি কি বলেছেন দেখুন। রাধারানী দেবী এবং নরেন্দ্র দেবের বিয়েটা শরৎচন্দ্র সমর্থন করেছিলেন। বিয়ের মধ্যে কোথাও কোনও সমস্যা ছিল। inter cast বা বিধবা বিবাহ নিয়ে সে যুগে problem ছিল। ছোট্ট কথার মধ্যে শরৎবাবু যা বললেন, আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে থেকে যে কথা শিখেছি প্রায় তার কাছাকাছি দেখলাম। তিনি লিখছেন, "সত্যিকারের ভালবাসার পরখ হল ত্যাগের প্রবৃত্তিতে। যে ভালবাসায় যত বেশী কল্যাণ বুদ্ধি, যত আত্ম উৎসর্গের প্রবৃত্তি, ত্যাগের প্রবৃত্তি আপনা হতেই গভীরতর হয় আর দৃঢ়তর হতে থাকে, সেই ভালবাসাই জেনো খাঁটি জাতের। সত্যিকারের ভালবাসা তার পাত্র বা পাত্রীকে সুস্থ ও সুখী দেখতে চায়। তাকে সার্থক ও গ্লানিহীন দেখতে চায়।... কোন মিলন যদি ভালবাসার পাত্রকে অগৌরবের মধ্যে নতশির করে আনে, লজ্জা দুঃখ বা অনুতাপ অনুশোচনা উন্মেষের সামান্যতমও ছিদ্র রেখে যায় তার জীবনে, সেই মিলন কখনও কল্যাণকর হতে পারে না। সুতরাং তা বাঞ্ছনীয় নয়। আবার এও সত্য বলিষ্ঠতার অভাবে, প্রেমের প্রতি স্থির বিশ্বাসের অভাবে, আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে, মিলনকে জীবনে বরণ করে নিতে যারা ভয় পায় সেই ভীরুদেরও প্রেমের দুর্গতি সমানই ঘটে।"[১৭] মানে ভালোবাসায় কোথাও মিলন কাম্য। কোথাও বিচ্ছেদ কাম্য। বলছেন, "সত্যিকারের ভালবাসা কল্যাণ বুদ্ধির আলোয় কোথাও সার্থক হয়ে ওঠে চির-বিচ্ছেদের মধ্যে, কোথাও সার্থক হয়ে ওঠে চির-মিলনের মধ্যে। যে ক্ষেত্রে বিচ্ছেদেই আসে প্রেমের কল্যাণ সেখানে সংযমের অভাবে মিলন এনে ফেললে সর্বনাশ। আবার যেখানে মিলনেই আছে প্রেমের কল্যাণ সেখানে বলিষ্ঠতার অভাবে বিচ্ছেদ রচনা করলেও ঠিক তেমনি সর্বনাশ ঘটে। গভীর ভালবাসায় সকলের চেয়ে প্রয়োজন মনের বলিষ্ঠতার। মিলন এবং বিচ্ছেদ উভয়ক্ষেত্রেই কঠিন সংযম এবং দৃঢ় বলিষ্ঠতার প্রয়োজন। বেছে নিতে হয় প্রেমে কাকে তুলে নিতে হবে মিলন, কাকে নিতে হবে বিচ্ছেদ। এরই মধ্যে প্রেমের আসল পরীক্ষা। আত্মদানেই শুধু প্রেমের সার্থকতা নয়, আত্মসংবরণেও।"[১৭] কত বড় উন্নত গভীর দৃষ্টিভঙ্গি। এ আমাদের মার্কসবাদীদের কাছাকাছি। যথার্থ ভালোবাসা যে নিছক রূপের আকর্ষণে নয়, সত্যিকারের মানুষকে চিনেই ভালোবাসার পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করতে হয় এটা বোঝাতে 'চরিত্রহীন'-এ বলছেন, "রূপ যৌবনের আকর্ষণটাই যদি ভালবাসার সবটুকু হ'ত দুশ্চিন্তার কথা উঠতো না। কিন্তু তা নয়। শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, বিশ্বাস কাড়াকাড়ি করে এদের পাওয়া যায় না। অনেক দুঃখে অনেক বিলম্বে এরা দেখা দেয়। যখন দেখা দেয় তখন রূপ যৌবনের প্রশ্নটা যে কোথায় মুখ লুকিয়ে থাকে খোঁজ পাওয়াই দায়। রূপটা ছায়া, মানুষ নয় — যেদিন বুঝবে সেদিনই সত্যিকারের ভালবাসার সন্ধান পাবে।" সমাজ যে স্ত্রীকে সম্মানের আসন দেয় না, স্বামী হাজার চেষ্টা করেও সেই সম্মান আদায় করতে পারে না, এটা আমি আগেই দেখিয়েছি

কীভাবে 'চরিত্রহীন'-এ সাবিত্রীর বক্তব্যে শরৎচন্দ্র এ বিষয়টা এনেছেন। সমাজের মধ্যে যাকে গৌরব দিতে পারা যায় না, তাকে কেবলমাত্র প্রেমের দ্বারাই সুখী করা যায় না। প্রেম, ভালোবাসা সম্পর্কে শরৎবাবুর সেক্যুলার outlook মার্কসবাদের কাছাকাছি। আবার 'পথের দাবী'তে দেখুন। ভারতীকে সব্যসাচী ছোট বোনের মতো খুবই স্নেহ করতেন। ভারতী ভালোবাসত অপূর্বকে, কিন্তু অপূর্ব দুর্বল, ভীরু, সে ভয়ে রেঙ্গুন ছেড়ে দেশে ফিরে যাচ্ছে, ভারতী কাতর হয়ে পড়েছে। ভারতী তার নিজের প্রতি বিশ্বাস হারাচ্ছে। এই অবস্থায় সব্যসাচী দুঃখ করে বললেন, "...দুর্ভাগা তোমার আনন্দই শুধু চুরি করে পালায়নি ভারতী, তোমার সাহসটুকু পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়ে গেছে।" ভারতী জবাব দিল, "...তুমিই ত আমাকে বারংবার বলেছ সংসারে ফিরে যেতে।" সব্যসাচী বললেন, "কিন্তু মাথা হেঁট করে যেতে ত বলিনি।" ভারতী বলল, "কিন্তু মেয়েমানুষের উঁচু মাথা সবাই পছন্দ করে না দাদা।" সব্যসাচী জবাব দিলেন, "তবে যেয়ো না।" এই জবাব শুধু ভারতীকে নয়, সমগ্র নারী জাতিকেই শরৎচন্দ্র দিয়ে গেছেন। মাথা নিচু করে, মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে প্রেম ও বিবাহ যেন গ্রহণ না করে।

আমি এখন আরও কিছু লেখা পড়ে শোনাব যদি শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি না হয়। আমি আগেই বলেছি যে, আমার আলোচনার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে যাঁরা শরৎ সাহিত্য পড়েন না তাঁদের পড়ার আগ্রহ জন্মানো। স্বার্থান্বেষী মহল কীভাবে ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রতাসাধনের মাহাত্ম্য বুঝিয়ে এবং ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে শোষিত মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ও ঠকাচ্ছে তার চিত্র মর্মস্পর্শী ভাষায় শরৎচন্দ্র একটি বক্তৃতায় ব্যক্ত করে বলছেন, "এদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মত হল, মানুষের জীবন যাত্রায় প্রয়োজনের ভিত্তি কমিয়ে আনা দরকার। অভাব বোধই দুঃখ। অতএব দশহাতের বদলে পাঁচ হাত কাপড় এবং পাঁচ হাতের বদলে কৌপীন পরিধান এবং যেহেতু বিলাসিতা পাপ সেহেতু সর্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনই মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্বোত্তম উপায়। এই পুণ্যভূমি ত্যাগমাহাত্ম্যে ভরপূর। একমাত্র উচ্চাঙ্গের দর্শন শাস্ত্রে কি আছে জানি না, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় এই ত্যাগের মন্ত্রই দিনের পর দিন সকল সাধারণকে মানুষের ধাপ থেকে নামিয়ে পশুর কোটায় টেনে এনেছে। উচ্চাকাঙক্ষা করবে কি! অভাব বোধটাই তাদের শুকিয়ে গেছে। ছোটজাত অস্পৃশ্য, তাতে কি! ভগবান করেছেন! এতে সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। যারা আর একটু বেশী জানে, তারা উদাস চক্ষে চেয়ে বলে সংসার তো মায়া! দুদিনের খেলা! এই জন্মে সন্তুষ্ট চিত্তে দুঃখ সয়ে গেলে আর জন্মে মুখ তুলে চাবেন। এক অদৃষ্ট ছাড়া আর কারো বিরুদ্ধে তাদের নালিশ নেই। চাইতে তারা জানে না, চাইতে তারা ভয় পায়। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শক্তি নেই, স্বাস্থ্য নেই, অভাবের পর অভাব নিরন্তর যতই চেপে বসে, ততই তারা সহ্য করার বর প্রার্থনা করে। তাতেও যখন কুলায় না তখন আকাশের পানে চেয়ে নিঃশব্দে চোখ বোজে।"[১৮] আজও কি এই ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব সমগ্র দেশের জনগণকে আচ্ছন্ন করে রাখেনি? একবার ভেবে দেখুন। সেই যুগেই গ্রামের ক্ষুধার

অন্ন-বঞ্চিত, জীর্ণশীর্ণ চেহারার, প্রবল শীতে একখণ্ড শীত-বস্ত্রহীন খালি গায়ের শিশুদের দেখিয়ে গভীর বেদনায় যা বলেছেন, আমি বিশ্বসাহিত্য যতটুকু পড়েছি কোথাও তা পাইনি। শ্রীকান্ত উপন্যাসে বলছেন, "পথের কুক্কুর যেমন জন্মিয়া গোটা কয়েক বৎসর যেমন-তেমন জীবিত থাকিয়া কোথায় কি করিয়া মরে তাহার যেমন কোন হিসাব কেউ রাখে না, এ হতভাগ্য মানুষগুলিরও ইহার অধিক দেশের কাছে একবিন্দু দাবী দাওয়া নাই। ইহাদের দুঃখ, ইহাদের দৈন্য, ইহাদের সর্বাঙ্গীণ দীনতা আপনার ও পরের চক্ষে এমন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, মানুষের কাছে মানুষের এতবড়ো লাঞ্ছনায়, কোথাও কাহারো মনে লজ্জার কণামাত্র নাই।" তারপরই বেদনায় ভারাক্রান্ত শ্রীকান্তের চেহারা দেখে সন্ন্যাসী আনন্দ বলছেন, "আপনি ভাবছেন এসব বুঝি এদের অহরহ দুঃখ দেয় কিন্তু তা মোটেই নয়। দুঃখটা বাস্তবিক কে ভোগ করবে দাদা। মন তো। কিন্তু সে বালাই কি আমরা ওদের রেখেছি? বহুদিনের অবিশ্রাম চাপে একেবারে নিংড়ে বার করে দিয়েছি। এর বেশী চাওয়াকে এখন নিজেরাই এরা অন্যায় স্পর্ধা বলে মনে করে।" অর্থাৎ এই পুঁজিবাদী সমাজ গরিবদের শুধু নির্মম শোষণ করছে তাই নয়, তাদের দুঃখবোধকে, বঞ্চনাজনিত যন্ত্রণাবোধকে, সব অনুভুতির মনকেও নিংড়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমার জানা নেই বিশ্ব সাহিত্যে কেউ এই বিষয়টা এমন করে দেখিয়েছেন। এরকমই মর্মস্পর্শী ভাষায় ওই উপন্যাসে শ্রমিকদের জীবন নিয়ে বলছেন, "সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধন লোভ মানুষকে যে কত বড় হৃদয়হীন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে এ দুটা দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া গেল। ...কিন্তু এই যে সমাজ হইতে, গৃহ হইতে, সর্বপ্রকারের স্বাভাবিক বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, লোকগুলোকে কেবলমাত্র উদয়াস্ত মাটি কাটার জন্যই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ট্রাকের উপর জমা করা হইয়াছে, এইখানেই তাহাদের মানব হৃদয়বৃত্তি বলিয়া, আর কোথাও কিছু বাকী নাই। শুধু মাটি কাটা, শুধু মজুরি। সভ্য মানুষে একথা বোধহয় ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়াছে মানুষকে পশু করিয়া লইতে না পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না।" তারপরেই তাঁর সেই ঐতিহাসিক উক্তি, "মানুষের মরণ আমাকে বড়ো আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে।" কীভাবে পুঁজিবাদ মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে হত্যা করছে, সেই সময়েই শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করেছেন, এবং যে মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, তা আজও আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। পুঁজিবাদ শ্রমিক জীবনকে কত নিচু স্তরে নামিয়েছে সেটা দেখাচ্ছেন, "সন্ধ্যাবেলা নর নারী নির্বিশেষে মাতাল হইয়া দলে দলে ফিরিয়া আসিল। দুপুর বেলা রাঁধা ভাত হাঁড়িতে জল দেওয়া আছে, এ হাঙ্গামাটাও এ বেলা মেয়েদের নাই। তাহার পরে কে কাহার কথা শোনে। জমাদারের গাড়ি হইতে ঢোল ও করতাল সহযোগে প্রবল সঙ্গীত চর্চা হইতে লাগল। সে যে কখন থামিবে ভাবিয়া পাইলাম না। কাহারো এজন্য মাথা ব্যথা নাই। আমার ঠিক পাশের ট্রাকে কে একটা মেয়ের বোধ হয় জনদুই প্রণয়ী জুটিয়াছে, সারা রাত্রি ধরিয়া

তাহাদের উদ্দাম প্রেমলীলার বিরাম নেই। এদিকে ট্রাকে এক ব্যাটা কিছু অধিক তাড়ি খাইয়াছে; সে এমনি উচ্চ কলরোলে স্ত্রীর কাছে প্রণয় ভিক্ষা করিতে লাগিল যে, আমার লজ্জার সীমা রহিল না। লজ্জা নাই, শরম নাই, গোপনীয় কোথাও কিছু নাই — সমস্তই খোলা, সমস্ত অনাবৃত। জীবন যাত্রার অবাধ গতির বীভৎস প্রকাশ তার অব্যাহত বেগে চলিয়াছে শুধু আমিই কেবল দল ছাড়া। আসন্ন মৃত্যুলোকযাত্রী মা ও তার ছেলেকে লইয়া গভীর আঁধার রাতে একাকী বসিয়া আছি। ছেলেটা বলিল, জল— মুখের উপর ঝুঁকিয়া কহিলাম, জল নেই বাবা, সকাল হোক। ছেলেটা ঘাড় নাড়িল। তারপর চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে রহিল। তৃষ্ণার জল না থাক, কিন্তু আমার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। হায় রে হায়! শুধু কেবল মানবের সুকুমার হৃদয়বৃত্তিই নয়, নিজের দুঃসহ যাতনার প্রতিও কী অপরিসীম ঔদাসীন্য! এ ত ধৈর্য্য শক্তি নয়, জড়তা, এ সহিষ্ণুতা মানবতার ঢের নীচের স্তরের বস্তু। আমি বেদনায় ক্ষোভে নিস্ফল আপশোসে বার বার অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম।" এই দুঃসহ মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরে শ্রমিকদের পুঁজিবাদ উচ্ছেদের আহ্বান জানিয়ে বললেন, "আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা, তোরা মর, কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদের এমন ধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না। যদি বহিতেই হয় ইহাকে তোরা দ্রুত বেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।" একই কথা একটি ছোট গল্প 'জাগরণ'-এ তিনি নারী চরিত্র আলেখ্যের মুখ দিয়ে বলালেন। প্রসঙ্গত এই গল্পে গ্রামীণ ধনীদের মধ্যে বলশেভিক বিপ্লব সম্পর্কে আতঙ্কও দেখিয়েছেন। আলেখ্য বলেছে, "…যে সভ্যতায় দরিদ্রের মুখের গ্রাস, দুঃখীর জীবন ধনীর মুঠোর মধ্যে এমন ভয়ানক নিরুপায় করে এনে দেয়, তাকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। সে কী-রকম সভ্যতা? আর তাই যদি হয়, এ সভ্যতায় আমার কাজ নেই। এই নির্দয় প্রহসন থেকে আমার মুক্তি চাই।" এই হচ্ছেন শরৎচন্দ্র। কীভাবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আহ্বান জানালেন।

শ্রীকান্তে দেখালেন এই workers life, যারা বিপ্লবী চেতনা পায়নি, বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়নি সেই শ্রমিকদের জীবনটা কী! এই চিত্র এমিল জোলা দেখিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'জার্মিনাল'-এ, আরও মর্মস্পর্শী চিত্র দেখালেন শরৎচন্দ্র। 'পথের দাবী'তে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে শোষকশ্রেণির অপপ্রচারের জবাবে তিনি বলছেন, "তোমরা অসাধু, তোমরা উচ্ছৃঙ্খল, তোমরা ইন্দ্রিয়াসক্ত—তাদের মুখ থেকে এই-সকল অপবাদই তোমরা চিরদিন শুনে এসেছ। তাই, যখনই তোমরা তোমাদের দাবী জানিয়েছ, তখনই তোমাদের সকল দুঃখ কষ্টের মূলে তোমাদের অসংযত চরিত্রকে দায়ী করে তারা তোমাদের সর্বপ্রকার উন্নতিকে নিবারিত করে এসেছে। — কেবল এই মিথ্যেই তোমাদের তারা অনুক্ষণ বুঝিয়ে এসেছে...। কিন্তু আজ আমি তোমাদের অসংকোচে এবং একান্ত অকপটে জানাতে চাই, এই উক্তি তাদের কখনই সম্পূর্ণ সত্য নয়। তোমাদের চরিত্রই শুধু তোমাদের অবস্থার জন্য দায়ী নয়। তোমাদের প্রবঞ্চিত হীন অবস্থাও তোমাদের চরিত্রের জন্য দায়ী। তাদের

এই অসত্যকে আজ তোমাদের নির্ভয়ে প্রতিবাদ করতেই হবে।” পুঁজিবাদী সমাজে শুধু শ্রেণিবিভক্তি ছাড়া অন্য কোন বিভক্তি যে নেই এবং শোষক শ্রেণি যে শ্রমিকদের ঐক্যের শক্তি, চেতনা ও প্রতিবাদের শক্তিকে ভয়ের চোখে দেখে এটা পরিষ্কার ভাষায় দেখিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন, “এই যে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, জৈন, শিখ কোনকিছুই নেই। আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর অশেষ প্রবঞ্চিত শ্রমিক। তোমাদের গায়ের জোরকে তারা ভয় পায়। তোমাদের শিক্ষার শক্তিকে তারা অত্যন্ত সংশয়ের চোখে দেখে। তোমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় তাদের রক্ত শুকিয়ে যায়।”

জমিদার-জোতদাররা কীভাবে চাষির জমি গ্রাস করে সেটা তিনি ‘দেনা-পাওনা’ উপন্যাসে দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন শুধু চাষিদের জমিই নয়, এমনকী এরা নিয়মিত যে মন্দিরে পুজোআচ্চা করে, সেই মন্দিরের মালিকানার দেবোত্তর সম্পত্তিও সুকৌশলে হস্তগত করতে দ্বিধাবোধ করে না। ‘মহেশ’ গল্পে দেখিয়েছেন, গ্রাম্য গরিব চাষি কি দুঃসহ যাতনায় সামান্য চাষের জমি, ভিটেমাটি, ঘটিবাটি ছেড়ে নিরুপায় হয়ে কন্যা সহ চটকলে কাজের জন্য চলে গেল, যেখানে ধর্ম-আব্রু থাকে না বলে গফুর ইতিপূর্বে কিছুতেই যেতে চায়নি। ‘পল্লীসমাজ’ উপন্যাসে দেখিয়েছেন, প্রবল বৃষ্টিতে চাষিদের ধানখেত ডুবে গেছে, জল বের করে না দিলে সর্বনাশ হবে। গরিব দরদি রমেশ তার জ্যেঠতুতো দাদা জোতদার বেণীর কাছে গিয়ে বলছে, “জলার বাঁধ আটকে রাখলে ত আর চলবে না, এখনই সেটা কাটিয়ে দিতে হবে।” বেণী কহিল, “সেই সঙ্গে দু-তিন শ’ টাকার মাছ বেরিয়ে যাবে খবরটা রেখেচ কি? এ টাকাটা দেবে কে? চাষারা না তুমি? ...এমন করিয়া ভায়া জমিদারী রাখবেন? ওহে রমেশ, হারামজাদারা সকাল থেকে এতক্ষণ এখানেই পড়ে মরা কান্না কাঁদছিল। আমি সব জানি। তোমার সদরে কি দারোয়ান নেই? তার পায়ের নাগরা জুতো নেই? যাও, ঘরে গিয়ে সেই ব্যবস্থা করো গে, জল আপনি নিকেশ হয়ে যাবে।” ...রমেশের আর সহ্য হইতে ছিল না, তথাপি সে প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করিয়া বিনীতভাবে কহিল, “ভেবে দেখুন বড়দা, আমাদের তিন ঘরের দু’শ টাকার লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরীবদের সারা বছরের অন্ন মারা যাবে। ...এরা সারা বছর খাবে কি?” ....বেণী একবার এ পাশ একবার ও পাশ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া মাথা নাড়িয়া, হাসিয়া, থুতু ফেলিয়া, শেষে স্থির হইয়া কহিল, “খাবে কি? দেখবে বেটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছে টাকা ধার করতে ছুটে আসবে। ভায়া, মাথা ঠাণ্ডা করে চলো, কর্তারা এমনি করেই বাড়িয়ে গুছিয়ে এই যে এক-আধ টুকরো উচ্ছিষ্ট রেখে গেছেন, এই আমাদের নেড়ে চেড়ে গুছিয়ে গাছিয়ে খেয়ে দেয়ে আবার ছেলেদের জন্য রেখে যেতে হবে! ওরা খাবে কি? ধার কর্জ করে খাবে। নইলে বেটাদের ছোটলোক বলেছে কেন?” কীভাবে নিষ্ঠুর জোতদার-জমিদার চাষিকে বিপাকে ফেলে তাদের জমি গ্রাস করে, তারই এক মর্মান্তিক চিত্র

এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র উপস্থিত করেছেন, সেটা সেইযুগে অন্য কারও সাহিত্যে পাওয়া যায় না। এই ধরনের ঘটনা আজও গ্রামাঞ্চলে আরও ব্যাপকভাবে ঘটছে। 'মহেশ' গল্পেও তিনি অন্যভাবে একই ঘটনা দেখালেন। দেখালেন মুসলিম বলে আমিনারা হিন্দু গাঁয়ের কুয়োর জল স্পর্শ করতে পারে না। শাস্ত্রজ্ঞ জমিদার-জোতদার ন্যায্য ভাগ থেকে ভাগচাষি গফুরকে বঞ্চিত করে, তার প্রাণাধিক চাষের গরু মহেশকে খড় থেকে বঞ্চিত করে এবং শেষপর্যন্ত জমিদারের দুঃসহ অত্যাচারে লাঞ্ছনায় গফুর ক্ষিপ্ত হয়ে তার সন্তানতুল্য মহেশকে হত্যা করে গ্রাম ত্যাগ করে চটকলে কাজের জন্য যায়। 'পল্লীসমাজ'-এ শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন জোতদারে রূপান্তরিত জমিদার বেণী ও তার দুষ্কর্মের সাকরেদ গোবিন্দরা নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে কর্তৃত্ব-আধিপত্য বজায় রাখতে সবরকমের অপকর্মই করে যাচ্ছে ধর্ম ও গ্রাম্য সমাজের দোহাই দিয়ে। এরই অন্যতম উৎস হচ্ছে টাকার জোর। মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে, মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করিয়ে, জাল দলিল তৈরি করে গরিবকে জব্দ ও সর্বস্বান্ত করা। এই ধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র লিখছেন, "ইহার ঋণ মিথ্যা, আসামী মিথ্যা, ফরিয়াদী মিথ্যা। এই সর্বব্যাপী মিথ্যার আশ্রয়ে সবল দুর্বলের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া বাহির করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে। অথচ সরকারের আদালতে এই অত্যাচারের প্রতিকারের উপায় সহজ নহে।..... রাজার আইন, আদালত, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত মাথার উপর থাকিলেও দরিদ্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিঃশব্দে মরিতে হইবে ..... অর্থবল এবং কুটবুদ্ধি একদিকে যেমন তাহাদিগকে রাজার শাসন হইতে অব্যাহতি দেয়, মৃত সমাজও তেমনি অন্যদিকে তাহাদের দুষ্কৃতির কোন দণ্ডবিধান করে না। তাই ইহারা সহস্র অন্যায় করিয়া সত্যধর্মবিহীন মৃত পল্লী-সমাজের মাথায় পা দিয়া এমন নিরুপদ্রবে এবং যথেচ্ছচারে বাস করে।" শরৎবাবু সেদিন যা দেখে এই কথা লিখেছেন, আজ সেটা বহু পরিমাণে বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে জোতদার-ব্যবসাদার-কন্ট্রাক্টার-সুদখোর-সরকারি দল-সরকারি দল নিয়ন্ত্রিত পঞ্চায়েত-পুলিশ প্রশাসন ও সমাজবিরোধীদের সম্মিলিত দুষ্টচক্র গরিব মানুষদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার-অবিচার-জুলুম-সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে, যার প্রতিরোধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে না ওঠায় এরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এই বঞ্চিত, অত্যাচারিত, শ্রমিক, চাষি ও নারীদের চোখের জল, হৃদয়ের মর্মভেদী আর্তনাদই যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার মূল উৎস, — একথা তিনি নিজেই ৫৭তম জন্মদিনের সংবর্ধনা সভায় বলেছিলেন, "আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য সেবার পুরস্কার দেশের কাছে আমি অনেক দিক দিয়ে অনেক পেলাম—আমার প্রাপ্যেরও অনেক বেশী। আজকের দিনে আমার সবচেয়ে মনে পড়ে এর কতটুকুতে আমার আপন দাবী, আর কত বড় এর ঋণ! ঋণ কি শুধু আমার পূর্ববর্তী পূজনীয় সাহিত্যাচার্যগণের কাছেই? সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছু, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে

যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেচি অবিচার, কত দেখেচি কুবিচার, কত দেখেচি নির্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে।" আপনারা বিশ্বে কি এমন কোনও সাহিত্যিক খুঁজে পাবেন, যিনি তাঁর সাহিত্য সাধনার মূলে কী ছিল, সেটা এভাবে ব্যক্ত করেছেন? তাই শরৎ সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার খুলে দেয়, মর্মস্থলে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে, বিবেককে তাড়না করে।

আমি আরও কিছু কথা বলতে চাই। শরৎবাবু রাজনৈতিক আন্দোলনের লোক ছিলেন। সাহিত্য সাধনার সাথে সাথে তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতেও নেমেছিলেন এবং তিনি এমনকী সাহিত্যসাধনা বন্ধ করেও রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। এ নিয়ে যখন তাকে বলা হয় কেন আপনি সাহিত্য চর্চা বন্ধ করে রাজনীতি করছেন? তিনি তখন বলছেন, দেশ সবচেয়ে বড়। দেশের আন্দোলনে না এলে যা ক্ষতি হত, সাহিত্যসাধনার ক্ষতি তত বড়ো নয়। কত বড়ো দেশপ্রেমিকের কথা! সেই যুগেই তিনি মার্কসবাদী না হয়েও গান্ধিজির রাজনীতির শ্রেণিচরিত্র চিনতে পেরেছিলেন। তিনি বলছেন, "তাঁর (গান্ধীজির) আসল ভয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছে ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কিভাবে। এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।"[১৭] এইভাবে সেই সময় গান্ধিজি সম্পর্কে কয়জন বলতে পেরেছেন! সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগেই দেশের রাজনীতিকে যে পুঁজিপতিরা শোষণের স্বার্থেই নিয়ন্ত্রণ করছে, এটা দেখিয়ে তিনি 'তরুণের বিদ্রোহ' ভাষণে বলেছিলেন, "এখন রাজা নেই, আছে রাজশক্তি। এবং সেই শক্তি আছে জনকয়েক বড় ব্যবসাদারদের হাতে। হয় স্বহস্তে করেন, না হয় লোক দিয়ে করান। বণিক-বৃত্তিই এখন মুখ্যতঃ রাজনীতি শোষণের জন্যেই শাসন।" অতি অল্প কথায় কত বড় বিপদ দেশবাসীকে চিনিয়ে দিয়ে গেলেন! সেদিন এভাবে ক'জন বলতে পেরেছে? শরৎবাবু শুধু সংস্কারবাদী আন্দোলনকে সমালোচনা করেননি, বিপ্লবীদের মধ্যেও যে অভাবটা বোধ করেছিলেন 'পথের দাবী'তে সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন, ছাত্র যুব সমাবেশেও বারবার বলেছেন। বলেছেন "বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লবপন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে।"[১৮] কত বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা! সেই যুগে সংস্কারবাদী ও বিপ্লববাদী সকলেই এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব অবহেলা করেছেন। যার কুফল আজও আমরা ভুগছি। 'পথের দাবী'তে বলছেন শশী কবিকে, "তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন, — ধর্ম, সমাজ, সংস্কার — সমস্ত ভেঙ্গেচুরে ধ্বংস হয়ে

যাক।" তিনিই একমাত্র বুঝেছেন, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভিত্তিতেই একমাত্র রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভব। কিন্তু সেই সময়ের রাজনৈতিক নেতারা কেউ এর গুরুত্ব দেননি এবং তার সর্বনাশা পরিণতি আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। তাই আজও দেশে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, জাতপাত এসব নিয়ে হানাহানি, নারী সম্পর্কে মধ্যযুগীয় মানসিকতা এসব শুধু চলছেই না, সরকারি দলগুলির উস্কানিতে বেড়েই চলেছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'তে দেখালেন। গান্ধিবাদীরা ও ইংরেজরা প্রচার করত, বিপ্লবীরা নিষ্ঠুর, নির্দয়, দয়ামায়া নেই। অথচ অপূর্ব বিপ্লবী দলের গোপন কথা পুলিশকে ফাঁস করে দেওয়ায় দলের প্রায় সকলেই তার মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু সব্যসাচী তা হতে দিলেন না, অথচ এর ফলে তাঁরই জীবন বিপন্ন হচ্ছিল। বললেন, 'অপূর্ব ট্রেইটার নয়, ভীরু।' অর্থাৎ ভয়ে পুলিশকে দলের কথা ফাঁস করে দেওয়া আর বিশ্বাসঘাতক হিসাবে তা করা এক নয়, মাস্টারদা সূর্য সেনও সব্যসাচীর এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন। সেই সময়ে একদল বিপ্লবী আন্দোলনের বিরোধিতা করে বিপ্লবীদের নিষ্ঠুর, দয়ামায়াহীন বলে প্রচার করত এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিবর্তে সমাজসেবার উপর গুরুত্ব দিত যেন স্বাধীনতা আন্দোলন নয়, এটাই আসল কাজ। এদের উত্তরে খেদের সাথে সব্যসাচী ভারতীকে বলেছিলেন, দেশের মধ্যে ছোটবড় এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা দেশের ঢের ভাল কাজ করে। আর্তের সেবা, নরনারীর পূণ্য সঞ্চয়ে প্রবৃত্তি দান করা, লোকের জ্বর ও পেটের অসুখে ঔষধ যোগানো, জল-প্লাবনে সাহায্য ও সান্ত্বনা দেওয়া — তাঁরাও তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন, ভারতী, কিন্তু আমি বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই — পাপ-পূণ্য আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস। ওই সব ভাল কাজ আমার কাছে ছেলেখেলা। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটিমাত্র সাধনা। এই আমার ভাল, এই আমার মন্দ, — এ ছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথাও কিছু নাই।"

ছাত্রদের স্বাধীনতা আন্দোলনে, বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য শরৎচন্দ্র বারবার আহ্বান জানিয়েছেন। ছাত্রদের মিটিং-এ বলেছেন — "সেদিনও সবাই জানতো, সবাই মানতো পলিটিক্স জিনিসটা কেবল বুড়োদের ইজারা মহল। ছেলেদের এখানে প্রবেশ একেবারে নিষেধ। শুধু অনধিকার চর্চা নয়, গর্হিত অপরাধ। তারা স্কুল কলেজে যাবে, শান্তশিষ্ট ভালো ছেলে হয়ে পাশ করে বাপ মায়ের মুখোজ্জ্বল করবে, এই ছিল সর্ববাদিসম্মত ছাত্র জীবনের নীতি। এর যে কোন ব্যত্যয় ঘটতে পারে, এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন মাত্র উঠতে পারে, এ ছিল যেন লোকের স্বপ্নাতীত। হঠাৎ কোথাকার কোন উল্টো ঝোড়ো হাওয়া এর কেন্দ্রটাকে ঠেলে নিয়ে একেবারে যেন পরিধির বাইরে ফেলে দিল। বিদ্যুৎ শিখা যেমন অকস্মাৎ ঘন অন্ধকারের বুক চিরে বস্তু প্রকাশ করে, নৈরাশ্য বেদনার অগ্নিশিখা ঠিক তেমনি করে আত্মশক্তি উদ্‌ঘাটিত করেছে। সমস্ত ভারতবর্ষময় কোথাও আজ সন্দেহের লেশ মাত্র নেই যে, এতদিন লোকে যা ভেবে এসেছে তা ভুল। সত্য তাতে ছিল না। তাই

তো আজ স্কুলে, কলেজে, নগরে, পল্লীতে, ভারতের প্রত্যেক ঘরে ঘরে যৌবনের ডাক পড়েছে।"[১৯] বলেছেন "ইস্কুল কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যাবস্থাতেও দেশের কাজে যোগ দেওয়ার, দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতা বিষয় চিন্তা করবার অধিকার আছে এবং এই অধিকারের কথাটাও মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করবার অধিকারও আছে, ...এগজামিনে পাশ করা দরকার। এ তার চেয়েও বড়ো দরকার।[২০] ঐ লেখাতেই বলেছেন, "সত্য সংবাদ পেলে পাছে তোমাদের মন বিক্ষিপ্ত হয়, পাছে তোমাদের স্কুল কলেজের পড়ায়, পাছে তোমাদের এগজামিন পাশের পরম বস্তুতে আঘাত লাগে, এ আশঙ্কায় মিথ্যে দিয়েও তোমাদের দৃষ্টি রোধ করা হয়। এ খবর হয়তো তোমরা জানতেও পার না।" যথার্থ দেশসেবক হতে গেলে কি চাই সেই সম্পর্কেও অমূল্য উপদেশ দিয়ে বলেছেন, 'দেশসেবা কথার কথা নয়, দেশসেবা মানবের শ্রেষ্ঠ সাধনা, নাম যশের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, স্বার্থ গন্ধ থাকবে না, প্রাণের ভয় পর্যন্ত থাকবে না, একদিকে দেশসেবক নিজে আর একদিকে তার দেশ, মাঝে আর কিছু থাকবে না। যশ, অর্থ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য ভাল মন্দ সব যে দেশের জন্য বলি দিতে পারে, দেশসেবা তার দ্বারাই হবে।"[২১] শরৎচন্দ্রের এই মূল্যবান আহ্বান আজকের দিনেও ছাত্র-যুবকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ সেদিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য শুধু বিদেশি শাসনের অবসানই নয়, শোষণ মুক্তির লক্ষ্যও ছিল। যা আজও হয়নি, বরং বহুগুণ বেড়েছে।

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রসঙ্গে তিনি সকলকে বিশেষত ছাত্র-যুবকদের শিক্ষণীয় মূল্যবান উপদেশ দিয়ে গেছেন। অনেকেই আছে নিজের অধিকার সম্পর্কে যতটা সোচ্চার প্রায় ততটাই গাফিলতি করে নিজের কর্তব্য পালনে, এদের সম্পর্কে তিনি 'স্বদেশ ও সাহিত্য' প্রবন্ধে বলছেন, "Right এবং duty দুটো অনুপূরক শব্দ ত সমস্ত আইনের গোড়ার কথা, ...কর্তব্যহীন অধিকারও অনধিকারের সমান।" কেউ আমাদের সাথে অসম্মানজনক কথা বললে বা আচরণ করলে আমরা আঘাত পাই, শরৎবাবু দেখালেন আমাদের এই প্রতিক্রিয়া সঠিক নয়, বরং তিনি 'আমার কথা' ভাষণে লিখছেন, "যথার্থ সম্মানের বস্তুকে যে মূঢ় অযথা ব্যঙ্গ করে, সমস্ত লজ্জা ত তারই।" কোনও কারণে দুঃখ যদি জীবনে আসে, তখন ভেঙে পড়লে চলবে না, বরং এই দুঃখ থেকে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, সেটা পেলে জ্ঞানার্জন হয়, দুঃখ জয় করে শান্তি বাড়ে, এভাবে দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করা যায়। তাই তিনি শ্রীকান্তে বলছেন, "দুঃখ জিনিসটা অভাব নয়, শূন্যও নয়। ভয় ছাড়া যে দুঃখ তাকে সুখের মতই উপভোগ করা যায়।" কেউ উত্তেজনার মুহূর্তে কিছু বললে বা করলে অনেক সময় আমরা সেটাকে ধরে নিয়েই তার বিচার করি। এটা যে ঠিক নয়, সেটা উল্লেখ করে শরৎবাবু 'গৃহদাহ'-তে বলছেন, "মানুষ তো দেবতা নয় — সে যে মানুষ। তার দেহ দোষে গুণে জড়ানো, কিন্তু তাই বলে ত আর দুর্বল মুহূর্তের উত্তেজনাকে তার স্বভাব বলে ধরে নেওয়া চলে না।" কাউকে সমালোচনার প্রশ্নে তিনি জন্মদিনের ভাষণে বলেছেন,

"উপযুক্ত সমালোচনা সর্বদাই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এই সমালোচনা করতে গিয়ে যদি তাকে নানারূপে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হয়, তাহলে এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছু নেই।"[২২] কাউকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে নেই, এই উপদেশ দিয়ে 'চরিত্রহীন'-এ বলেছেন, "আমরা যথার্থ অন্যায় তখনই করি, যখন কাহাকেও তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করি। সুতরাং কোন কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ইহাই দেখা প্রয়োজন যে, কাহারো সত্যিকার অধিকারে হাত দিয়েছি কিনা।" কারও দুঃখ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে নেই, এই মূল্যবোধের কথা স্মরণ করিয়ে — 'শ্রীকান্তে' তিনি বলছেন, "একের মর্মান্তিক দুঃখ যখন অপরের কাছে উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, তাহার চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি পৃথিবীতে আর আছে কি?" যেমন কোনও সামাজিক আন্দোলনে, লড়াইতে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেকেই ভাবে আমি একা, কী করে করব। শরৎচন্দ্র তাদের উদ্দেশে 'স্বরাজ সাধনায় নারী' প্রসঙ্গে বলছেন, "পৃথিবীর কোন সংস্কারই কখনও দল বেঁধে হয় না, একাকীই দাঁড়াতে হয়। এর দুঃখ আছে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত একাকীত্বের দুঃখ, একদিন সংঘবদ্ধ হয়ে বহুর কল্যাণকর হয়।" যথার্থ মানুষ হওয়া বলতে কি বোঝায় 'পথের দাবী'তে স্বল্প কথায় অমূল্য ব্যাখ্যা দিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "মানুষ হয়ে জন্মানোর মর্যাদাবোধকেই মানুষ হওয়া বলে। মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।" কথা অল্প, তাৎপর্য কত গভীর! সাহিত্য সভার অভিভাষণে তিনি বলেছেন, বড় হতে গেলে মহৎ আদর্শ, মহৎ ব্যক্তিকে খুঁজে নিতে হয়। তাই বলেছেন, "মহত্ত্ব জিনিসটা কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে না। তাকে সন্ধান করে খুঁজে নিতে হয়। মানুষ যখন মহত্ত্বের সন্ধান করতে ভুলে যাবে তখন সে নিজেকে ছোট করে আনবে।"[২৩] অর্থাৎ মহত্ত্বকে খোঁজার মন না থাকলে জীবন আদর্শবিহীন হয়ে যাবে, তুচ্ছ হয়ে যাবে। ছাত্র-যুবকরা যাতে ভণ্ডামির পথে না যায়, সেজন্য 'সত্যাশ্রয়ী' বক্তৃতায় ওয়ার্নিং দিয়ে বলেছেন, "ভুল বুঝে ভুল কাজ করায় অজ্ঞতার অপরাধ হয়, সেও ঢের ভাল, কিন্তু ঠিক বুঝে বেঠিক কাজ করায় শুধু সত্যভ্রষ্টতার নয়, অসত্য-নিষ্ঠার প্রত্যবায় হয়।" এই কথা আজকের দিনে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক যখন চতুর্দিকে, মিথ্যাচার, ভণ্ডামি, প্রতারণার স্রোত বয়ে চলেছে সরকারি দলগুলির উদ্যোগে। ছাত্র-যুবকদের উদ্দেশে ৫৭তম জন্মদিনে সেনেট হলের সংবর্ধনা সভায় বলেছেন, "মিথ্যাকে তোমরা কোনদিন কোন ছলেই স্বীকার করো না, — সত্যের পথ, অপ্রিয় সত্যের পথ — যদি পরম দুঃখের পথও হয়; তা হলেও সে দুঃখ-বরণের শক্তি নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ করো। দেশের এবং দশের যে ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে নির্ভর করছে, সে ভবিষ্যৎ যে কখনও দুর্বলতার দ্বারা, ভীরুতার দ্বারা এবং অসত্যের দ্বারা গঠিত হয় না, তোমাদের পানে তাকিয়ে দেশের লোকে যেন এই কথাটা নিরন্তর মনে রাখতে পারে"। শরৎচন্দ্রের এই মূল্যবান উপদেশ আজকের দিনে আরও কত প্রাসঙ্গিক সেটা আপনারা নিশ্চয়ই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছেন। এছাড়া সকলের জন্যই বেশ কিছু

অমূল্য শিক্ষা তিনি রেখে গেছেন। তার কয়েকটি অন্তত উল্লেখ করতে চাই। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলা কীভাবে সুরেশের সাথে চলে যেতে বাধ্য হয়, সে কথা আগেই আপনাদের বলেছি। এভাবে অচলা চলে যাবার পর তার বাবা কেদারবাবু দুঃখে-বেদনায়-লজ্জায় ভেঙে পড়েন। সেই সময়ে তাঁকে সেবা-যত্ন-সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে মৃণাল। কেদারবাবু বারবার বলেছিলেন, অচলাকে মাপ করা যায় না, তার উত্তরে মৃণাল জবাব দিয়েছিল, "যার কার্য্যকারণ আমাদের জানা নেই; অন্ততঃ মনে মনে তার বিচার করে তাকে অপরাধী করে রাখবো না।" তাছাড়া আরেকটি কথাও মৃণাল বলেছিল, "....ক্ষমার ফল কি শুধু অপরাধীই পায়, যে ক্ষমা করে, সে কি কিছুই পায় না?" অনেক সময় আমরা কি কারণে কি ঘটছে এসব না দেখে যে কোনও অসঙ্গত কাজ বা ভুলের জন্য কাউকে দোষী সাব্যস্ত করি, এটা যে অনুচিত সেটাই তিনি দেখালেন। আর তিনি দেখালেন, আত্মীয়-পরিচিত কেউ অন্যায় বা ভুল করলে আমাদের রাগ-বিরক্তি-ক্ষোভ-বিদ্বেষ হয়, এর ফলে মন অশান্ত হয়। কিন্তু তাকে ক্ষমা করলে সে-ই শুধু লাভবান হয় না, নিজের মন রাগ-বিরক্তি-অশান্তির জ্বালা মুক্ত হয়। 'পথের দাবী'তে শরৎচন্দ্র আরেকটি মূল্যবান শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন, "হৃদয়াবেগ দুর্মূল্য বস্তু, কিন্তু চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করতে দিলে এতবড় শত্রু আর নেই।" অর্থাৎ তিনি বলেছেন, স্নেহ-মমতা-প্রেম-ভালোবাসা, রাগ-অভিমান-দুঃখ-শোক এগুলি আবেগেরই প্রকাশ, আবেগহীন মানুষ যন্ত্র হয়ে যায়, কিন্তু এগুলি যদি চেতনাকে, যুক্তি বিচারকে আচ্ছন্ন করে দেয়, তাহলে এই আবেগ শত্রুর মতোই ক্ষতি করে। তাই যুক্তি বিচার দিয়ে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, পরিচালনা করতে হয়। একটি মূল্যবান জ্ঞানের কথা তিনি সকলকেই বলেছিলেন, "উপস্থিত factগুলোই সংসারে সত্যের মুখোশ পরে, মানুষের কর্ম ও চিন্তার ধারার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করে, অপরিমেয় অনর্থের সূচনা করে দেয়।"[২৪] ইংরেজিতে fact, true, truth-এগুলির অর্থ আলাদা, fact বা true হচ্ছে ঘটনা বা সঠিক ঘটনা। কিন্তু truth হচ্ছে সত্য, যেটা হচ্ছে মূল্যবান আদর্শ, সেটা মানুষের কল্যাণের জন্য, সমাজপ্রগতির জন্য রচিত হয়। একটা বিশেষ যুগে মহান চিন্তানায়কেরা, বড় মানুষেরা সেটা উদ্ভাবন করেন। কিন্তু চলতি কথায় fact বা true fact-এর সাথে truth-কে গুলিয়ে ফেলে ভুল বোঝা হয়। ফলে fact হলেই truth গণ্য করা যায় না। আর এজন্যই 'পথের দাবী'তে শরৎচন্দ্র সব্যসাচীকে দিয়ে বলিয়েছেন, "আমি মিথ্যা বলিনে, আমি প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করি।" 'পণ্ডিতমশাই'তে শরৎচন্দ্র সদ্য শিশু সন্তানহারা শোকার্ত বিমাতা কুসুমকে কীভাবে এই শোক সামলাতে হয় সেটা স্বামী বৃন্দাবনকে দিয়ে বলিয়েছেন, "সে তোমার মরেনি, হারায়নি, শুধু লুকিয়ে আছে — একবার ভাল করে চেয়ে দেখতে শিখলেই দেখতে পাবে, যেখানে যত ছেলেমেয়ে আছে, আমাদের চরণও তাদের সঙ্গে আছে।" অন্যদিকে এই লেখায় যেসব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক গরিবদের কল্যাণের জন্য বিনাপয়সায় পাঠশালা খোলে, কিন্তু মধ্যবিত্ত complex থেকে

মুক্ত হতে না পেরে ব্যর্থ হয়, তাদের কাছেও এক শিক্ষণীয় বার্তা শরৎচন্দ্র দিয়ে গেছেন। তথাকথিত নিম্নবর্ণের বৃন্দাবন কিছুটা লেখাপড়া শিখে গ্রামের গরিবদের জন্য পাঠশালা খোলে, সেখানে দলে দলে ছাত্রছাত্রী আসে এবং শ্রদ্ধা ও আবেগের সাথে বৃন্দাবনকে পণ্ডিতমশাই বলে সম্বোধন করে। আবার তারই বাল্যবন্ধু উচ্চবর্ণের কেশব উচ্চশিক্ষিত। নিজে অবিবাহিত থেকে গরিবদের জন্য বিনা পয়সায় পাঠশালা খুলেছে, কিন্তু ছাত্র জোটেনি। তাই আক্ষেপ করে বলছে, "....তোমাদের মত আমাদের গাঁয়েও লেখাপড়া শেখবার বালাই নেই, তাই প্রথমে একটা পাঠশালা খুলে — শেষে একটা স্কুল দাঁড় করাব মনে করি — তা আমার পাঠশালাই চলল না — ছেলে জুটলো না। আমাদের গাঁয়ের ছোটলোকগুলো এমনি শয়তান যে, কোনমতেই ছেলেদের পড়তে দিতে চায় না।" এই কথা শুনে বৃন্দাবনের মুখ রাঙা হয়ে গেল। কিন্তু শান্ত হয়ে জবাব দিল, "....ছোটলোকদের ভাগ্য ভাল যে, ভদ্রলোকের পাঠশালে ছেলে পাঠায় নি। কিন্তু তোমারও ভাই, আমাদের মত ছোটলোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মান-ইজ্জত নষ্ট করা উচিত হয়নি।" তারপর বলল, ".....আমি দলের মধ্যে থেকেই বড়, দল ছাড়া বড় নই, তাই তারা অসঙ্কোচে আমার কাছে এসেছে — তোমার কাছে যেতে ভরসা করেনি। আমরা অশিক্ষিত, দরিদ্র, আমরা মুখে আমাদের অভিমান প্রকাশ করিতে পারিনে, তোমরা ছোটলোক বলে ডাকো, আমরা নিঃশব্দে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের অন্তর্যামী স্বীকার করেন না। তিনি তোমাদের ভাল কথাতেও সাড়া দিতে চান না। ....আমাদের মধ্যে হাতুড়ে বদ্যি, হাতুড়ে পণ্ডিতই প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করে— যেমন আমি করেচি, কিন্তু তোমাদের মত বড় ডাক্তার প্রফেসররা আমল পায় না। আমাদের বুকের মধ্যেও দেবতা বাস করেন, তোমাদের এই অশ্রদ্ধার করুণা, এই উঁচুতে বসে নীচে ভিক্ষা দেওয়া তাঁর গায়ে বেঁধে, তিনি মুখ ফেরান।..... শুধু ইচ্ছা এবং হৃদয় থাকলেই পরের ভালো এবং দেশের কাজ করা যায় না। যাদের ভাল করবে, তাদের সঙ্গে থাকার কষ্ট সহ্য করতে পারা চাই, ...আগে নিজেদের আচার-ব্যবহারে দেখাও, তোমরা লেখাপড়া-শেখা ভদ্রলোকেরা একেবারে স্বতন্ত্র দল নও। লেখাপড়া শিখেও তোমরা দেশের অশিক্ষিত চাষাভূষোকে নেহাত ছোটলোক মনে কর না, বরং শ্রদ্ধা কর, তবেই শুধু আমাদের ভয় ভাঙ্গবে....." এটা শুধু সোস্যাল ওয়ার্কে লিপ্তদের জন্যই নয়, বিপ্লবী আন্দোলনে আসা মধ্যবিত্ত ঘরের লেখাপড়া জানা কর্মীদের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মূল্যবান শিক্ষা, এটা আমাদের বুঝতে হবে।

সেদিন শরৎচন্দ্রের আহ্বানের যথার্থ মূল্য দিয়েছিল এদেশের শত শত ছাত্র-যুবক, যারা সবকিছু ছেড়ে নিঃস্বার্থে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অনেকে ফাঁসির মঞ্চে গেয়েছেন জীবনের জয়গান। আর আজ কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম এবং তৃণমূল ইত্যাদি ক্ষমতাসীন দলগুলির কল্যাণে 'দেশসেবকদের' যা মূর্তি দেখা যাচ্ছে, সেই সব দেখে দেশের মানুষ আঁতকে উঠছে। টাকা কামানো, তোলাবাজি,

বোমাবাজি, খুন-খারাপি, মাতলামি, নারীপাচার, নারীনির্যাতন, সন্ত্রাস সৃষ্টি কোনও কিছুই এদের আটকায় না। এটা কেন ঘটল? এর উত্তর দিয়েছেন বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ। তিনি এক ঐতিহাসিক আলোচনায় বলেছেন, "শরৎচন্দ্রকে বিস্মৃত হওয়ার ফলেই আজকের দিনের রাজনৈতিক আন্দোলন, গণআন্দোলন, সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে নীতিনৈতিকতা, রুচি-সংস্কৃতির মানটা নেমে গিয়েছে। যে উঁচু মানটা এক সময় এ দেশে গড়েও উঠেছিল, তা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ফলে, আমরা ছিন্নমূল হয়ে গিয়েছি। তাই আমরা বড় কথা বলি, কিন্তু বড় হৃদয়বৃত্তির কারবার করি না। কোনও আন্দোলনই তো শুধুমাত্র বুদ্ধির কারবার নয়। — বুদ্ধি এবং হৃদয়বৃত্তির কারবার।"২৫ সেই যুগেই শরৎচন্দ্র ছাত্র-যুবকদের মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছেন যে, তারা যেন কোনও অবস্থাতেই ভণ্ডামি বা প্রতারণার পথে না যায়, এটা অপরাধের সামিল। তিনি বলেছেন, "ভুল জানা ভ্রান্ত ধারণা, বরঞ্চ সেও ভালো, কিন্তু ভিতরের জানা এবং বাইরের আচরণে যদি সামঞ্জস্য না থাকে, অর্থাৎ যদি জানি একরকম, বলি আর একরকম, করি আর এক রকম, তবে জীবনে এত বড়ো ব্যর্থতা, এত বড়ো ভীরুতা আর নেই। যৌবন ধর্মকে এতখানি ছোট করতে আর দ্বিতীয় কিছু নেই। ভুল বুঝে ভুল কাজ করায় অজ্ঞতার অপরাধ হয়। সেও ঢের ভালো কিন্তু ঠিক বুঝে বেঠিক কাজ করা শুধু সত্য ভ্রষ্টতা নয়, অসত্য নিষ্ঠায় প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বুঝি ছোঁয়াছুঁয়ি, আচার বিচারের অর্থ নেই তবু মেনে চলি, বুঝি জাতিভেদ মহা অকল্যাণকর, তবু নিজের আচরণে তাকে প্রকাশ করিনে, বুঝি ও বলি বিধবা বিবাহ উচিত, তবু নিজের জীবনে প্রত্যাহার করি, একেই আমি বলি অসত্যাচরণ।"৩ বলা বাহুল্য আজকের দিনের সরকারি দলগুলির নেতারা সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শই দেশের ছাত্র-যুবকদের কাছে উপস্থিত করছে। ফলে এর যা কুফল তাই ঘটছে। গান্ধিবাদীদের ভিক্ষার পথে, আবেদন-নিবেদন-আপসের পথে যে যথার্থ স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, এর জন্য যুবকদের বিপ্লবের পথে রক্ত ঢালতে হবে, সেই আহ্বান জানিয়ে শরৎচন্দ্র 'তরুণের বিদ্রোহ' বক্তৃতায় বলেছিলেন, "...স্বাধীনতা শুধু একটা নামমাত্রই নয়। দাতার দক্ষিণ হস্তের দানেই তো একে ভিক্ষার মতো পাওয়া যায় না। এর জন্য মূল্য দিতে হয়। কোথায় মূল্য? কার কাছে আছে? আছে শুধু যৌবনের রক্তের মধ্যে সঞ্চিত।" প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কেন বেধেছে তার মূল কারণ দেখিয়ে তিনি বলছেন, —"দশ পনের বছর পূর্বে যে জগৎব্যাপী সংগ্রাম হয়ে গেল তার গোড়াতেও ছিল ঐ একই কথা। ঐ বাজার আর খদ্দের নিয়ে দোকানদারদের কাড়াকাড়ি।"১৮ সাম্রাজ্যবাদীরা হচ্ছে দোকানদার। আর বাজারের খদ্দের হচ্ছে উপনিবেশগুলো। কত ছোট্ট কথা। অথচ কত বড় একটা সত্য ধরিয়ে দিয়ে গেলেন। সশস্ত্র বিপ্লবের বিরুদ্ধে যারা অহিংস ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথা বলছে তাদের আসল চরিত্র ধরিয়ে দিয়ে 'পথের দাবী'তে বলছেন, "শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে! কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেছে জানো। যারা পরের শান্তি হরণ

করে, পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যা মন্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত নর নারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে করে তাদের এমন করে তুলেছে যে আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে ওঠে। ভাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল!" "বাঁধা গরু অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেছো? সে দাঁড়িয়ে মরে, তবু সে জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে মনিবের শান্তি নষ্ট করে না।" যারা শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের বুলি আওড়ায় এবং ধর্মঘটের ফলে ক্ষতি হয় বলে প্রচার করে, তাদের প্রতিবাদে ঐ উপন্যাসেই শরৎবাবু বলছেন— "ধর্মঘট বলে একটা বস্তু আছে, কিন্তু নিরুপ্রদব ধর্মঘট বলে কোথাও কিছু নাই। সংসারে কোন ধর্মঘটই সফল হয় না যতক্ষণ না পিছনে তার বাহুবল থাকে। ধনীর আর্থিক ক্ষতি আর দরিদ্রের অনশন এক নয়।" বিপ্লবী উদ্দেশ্যবর্জিত নিছক অর্থনৈতিক দাবিতে শ্রমিক ধর্মঘটকে সমালোচনা করে তিনি 'পথের দাবী'তে বলেছেন, "কোথাও কোন দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব বাধানো যায় না, একটা কিছু অবলম্বন তার চাই-ই চাই। সেই ত আমার অবলম্বন। যে মূর্খ একথা জানে না, শুধু মজুরির কম-বেশি নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায় সে তাদেরও ক্ষতি করে, দেশেরও করে।" একবার ভেবে দেখুন, আজকের দিনের রাজনীতিতেও এই মূল্যবান বক্তব্যগুলো কত প্রাসঙ্গিক!

আরেকটি অত্যন্ত মূল্যবান সতর্কবাণীও তিনি 'পথের দাবী'তে বলেছেন, যদিও সেটা বলেছেন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ সম্পর্কে। কিন্তু যেখানেই শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থা আছে, যেখানেই শাসক ও শাসিত শ্রেণি আছে, সকলের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। সব্যসাচীর কণ্ঠে তিনি বলেছেন, ".....শাসক এবং শাসিতের নৈতিক বুদ্ধি যখন এক হইয়া দাঁড়ায় তাহার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর দেশের নাই।" দাসপ্রথা, রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সকল শাসনব্যবস্থাতেই শাসকশ্রেণি শুধু সশস্ত্র রাষ্ট্রীয় শক্তির দমন-পীড়নের উপরই নির্ভর করে না, বরং এটা তাদের শেষ অবলম্বন। তার চেয়ে শক্তিশালী শক্তিরূপে তাদের পক্ষে কাজ করেছে শোষিত-শাসিত জনগণের মানসিকতা ও শাসকশ্রেণির অনুকূল নৈতিকতা যা শাসকশ্রেণি গড়ে তোলে যাতে অত্যাচারিত-শাসিত জনগণ বিনা প্রতিবাদে এই শাসন-শোষণকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়। তাই বিপ্লবী ক্ষুদিরামরা যখন বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে তুলছিল, তখন তাদের পাশে দেশের জনগণ ছিল না, অনেকে আশ্রয়ও দিতে চাইত না। তাই অতি দুঃখে সব্যসাচী সেদিনের দেশবাসী সম্পর্কে বলছেন, ..."তারা ত এ কাজ করতে আমাদের বলে না। বরং আমরা তাদের স্বস্তির বাধা, আরামের অন্তরায়।... দাদার যদি ফাঁসি হয়েছে শোনো, জেনো, বিদেশীর হুকুমে সে ফাঁসি তার দেশের লোকই তার গলায় বেঁধেছে।" এই হচ্ছে এদেশের স্বদেশি আন্দোলন যুগের প্রথম অধ্যায়ের বিপ্লবীদের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। ব্রিটিশদের অত্যাচার থেকেও এই দুঃখ, এই যন্ত্রণা ছিল আরও কষ্টকর। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা দমেনি, এগিয়ে গেছেন জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য গণ্য করে। শুধু এই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেই নয়, সর্বযুগে সর্বদেশে মুক্তি আন্দোলনে, অন্যায়-

অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহৎ আন্দোলনে পথপ্রদর্শক বড় মানুষদের ক্ষেত্রে, সংগ্রামী যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ঘটেছে। যাদের মুক্তির জন্য, কল্যাণের জন্য তাঁরা লড়েছেন, তারাই প্রথম দিকে সমর্থন তো দূরের কথা এমনকী বিরুদ্ধতা করেছে, বাধা দিয়েছে। তাই 'পল্লীসমাজ'-এ রমেশ যখন গ্রামবাসীদের কল্যাণের জন্য নানা কাজ করতে গিয়ে গ্রামবাসীদেরই বাধা ও ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হয়ে মুষড়ে পড়ছিল, তখন জ্যেঠাইমা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, "....পৃথিবীতে ভাল করবার ভার যে কেউ নিজের উপর নিয়েছে, চিরদিনই তার শত্রুসংখ্যা বেড়ে উঠেছে।" প্রথম দিকে এটা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আজকের দিনে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামীদের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। সহজে কেউ শুনতে চায় না, বিশ্বাস করতে চায় না, বরং বিরুদ্ধতা করে, সাহায্য করা তো দূরের কথা। পুঁজিবাদী শাসকসৃষ্ট মানসিকতায় শোষিত মানুষ মনে করে ধনী-গরিব চিরদিন ছিল, চিরদিন থাকবে, এ ঈশ্বরের বিধান, অদৃষ্টের লিখন, পূর্ব জন্মের কর্মফল। যারা একটু শিক্ষিত তারা বলে ব্যক্তিমাত্রেরই স্বার্থপরতা, লাভ-লোভ, মালিকানাবোধ থাকবেই, পুঁজিপতিদের মুনাফা না থাকলে শিল্প চলবে কী করে! একদিকে এইসব সর্বনাশা চিন্তা, অন্যদিকে ভয়ে- লোভে শাসকশ্রেণী ও তাদের আশীর্বাদপুষ্ট দলগুলির হয়ে কাজ করা — এসবের বিরুদ্ধেই আজকের দিনের বিপ্লবীদের লড়তে হচ্ছে। তাদের কাছে শরৎচন্দ্রের এই শিক্ষা খুবই মূল্যবান।

যাঁরা বলেন শরৎচন্দ্রের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি নেই, এতক্ষণ ধরে যা পড়লাম এর মধ্যে কী দেখতে পাচ্ছেন তারা? এ যদি বুদ্ধিবৃত্তি না হয়, তাহলে বুদ্ধিবৃত্তি কাকে বলে? যাঁরা এই সমালোচনা করেন, একমাত্র সেই সব বুদ্ধিবৃত্তির মালিকরাই তার উত্তর দিতে পারবেন। হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিতে শুধু এদেশেই নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও তিনি বিরল। কত চিন্তাশীল মননশীলতার প্রকাশ শরৎ সাহিত্যের মধ্যে আছে! রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক কিছু লেখকের সাহিত্য সম্পর্কে বলছেন, "উপন্যাস সাহিত্যেরও সেই দশা, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।" মানে intellectualism-এর চাপে সাহিত্যে মানুষের প্রাণটা চাপা পড়ে গেছে। শরৎবাবু উত্তর দিয়েছেন, "উপন্যাস সাহিত্যে সেই দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েনি, চিন্তার সূর্যালোকে মানুষের প্রাণের রূপ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।" রবীন্দ্রনাথের সাথে শরৎচন্দ্রের মত পার্থক্য হয়েছিল সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক বিচার থাকবে কিনা। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিরোধী ছিলেন। তিনি 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "...বিজ্ঞান প্রবল হয়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মানতে চায় না। তার প্রভাব মানব-মনের সকল বিভাগেই আপন পিয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার তকমা পরে কোথাও সে অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। ...এই কৌতুহলের বেড়াজাল এখনকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরেছে।" এর উত্তরে শরৎচন্দ্র 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধে লিখলেন, "...বিজ্ঞানের প্রতি কবির হয়ত একটা স্বাভাবিক বিমুখতা আছে, কিন্তু

বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বলিলে যে কি বুঝায় আমি বুঝিলাম না। বিজ্ঞান বলিতে যদি শুধু Sex-psychology, Anatomy অথবা Gynaecology বুঝাইত তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যে ইহার অবারিত প্রবেশে আমিও বাধা দিতাম। কেবল অবাঞ্ছিত বলিয়া নয়, অহেতুক ও অসঙ্গত বলিয়া আপত্তি করিতাম। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, ইহা যত বড় কথাই হউক, সাহিত্যের মন্দিরে ইহার প্রয়োগ গৌণ, কিন্তু যে সুবিন্যস্ত, সংযত চিন্তাধারার ফল এই জিনিসটি, সে চিন্তা নহিলে কাব্যের চলে চলুক, উপন্যাসের চলে না। বিজ্ঞান ত কেবল অপক্ষপাত কৌতূহল মাত্রই নয়, কার্যকারণের সত্যকার সম্বন্ধ-বিচার।"

শরৎচন্দ্র এই বৈজ্ঞানিক মননটা কোথা থেকে পেলেন? হিন্দুধর্ম শাসিত সমাজে যখন বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধিজিদের প্রবল প্রভাব চলছে, তখন সেই পরিবেশে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সেক্যুলার মানবতাবাদী বিচারধারা অর্জন করা খুবই কঠিন ছিল। একদিকে সমাজের মধ্যে অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষের কান্না, চোখের জল, নারী জাতির লাঞ্ছনা, অবমাননা, এসব শরৎচন্দ্রকে খুবই ভাবিয়েছে, সমাধান কোথায়, বার বার খুঁজেছেন। অন্যদিকে পথ খুঁজতে গিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও সেক্যুলার মানবতাবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। তখন দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার চলছিল, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সদ্য শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র সোভিয়েত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উভয়েরই প্রভাব তাঁর মধ্যে কাজ করেছে। এই সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রভাব পড়েছিল বলেই তাঁর সেক্যুলার মানবতাবাদী চিন্তা ইউরোপের প্রথম যুগের থেকেও বলিষ্ঠতর হতে পেরেছিল। তিনি এদেশের বিপ্লবী ধারাকে সমর্থন করলেও তাদের ত্রুটি সীমাবদ্ধতা দেখিয়েছেন, সেটা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। সত্যের সাধনায় ব্রতী হয়ে চিরে চিরে তিনি সমাজকে দেখেছেন। প্রত্যেকটি জিনিস বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞান ও দর্শনের বইপত্র খুবই পড়াশোনা করতেন। তাই তাঁর লাইব্রেরিতে মার্কস-এঙ্গেলস্ লেনিনের বই পাওয়া যায়। এগুলোও তিনি কিছু কিছু বোঝবার চেষ্টা করেছেন। যদিও তিনি মার্কসবাদী ছিলেন না, মূলত বস্তুবাদী ও সেক্যুলার মানবতাবাদী ছিলেন। কিন্তু চলতে চলতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার খুবই কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন। তাই তিনি এতবড় বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের বহুমুখী সৃষ্টি সবই সমাজের আকুতি ব্যথা বেদনা আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ে। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি শুধু সাধারণ মানুষের হৃদয়ই জয় করেননি, সেই যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষেরাও তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শরৎচন্দ্রকে গভীর শ্রদ্ধায় বন্ধু গণ্য করতেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন, নানা মিটিঙ-এ টেনে নিয়ে যেতেন। আবার আদর্শের প্রশ্নে তিনি কখনও কারও সাথে compromise করেননি। দেশবন্ধু

একবার শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন, যাতে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবীদের কিছুদিন নিরস্ত থাকার আবেদন করেন, শরৎচন্দ্র সম্মত হননি। একবার গান্ধিজি দেশবন্ধুর বাড়িতে বিপ্লবীদের traitor বলেছিলেন। প্রতিবাদে শরৎচন্দ্র দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, মত পার্থক্যের কারণে যদি আপনি তাদের traitor বলতে পারেন, তাহলে একই কারণে আমিও আপনাকে তা বলতে পারি। শরৎচন্দ্রকে চরকা কাটতে দেখে একবার গান্ধিজি প্রশ্ন করেন, "শরৎ তুমি তো চরকায় বিশ্বাস কর না, তবে এত ভালো করে কাটছ কী করে?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি একজন কংগ্রেস সদস্য হিসাবে ডিসিপ্লিন মেনে চরকা কাটছি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি attainment of swaraj can only be done by soldiers, not by spiders."[২৬] ১৯২২ সালে নন-কোঅপারেশন আন্দোলন চলছিল। সে সময় গোরক্ষপুরে চৌরিচৌরা থানার পুলিশ বিক্ষোভকারী জনগণের উপর গুলি চালিয়ে বেশ কিছু মানুষকে খুন করে। ফলে জনতা উত্তেজিত হয়ে থানায় আগুন লাগিয়ে দেয়। আন্দোলন সহিংস হচ্ছে দেখে গান্ধিজি আন্দোলন তুলে নেন। এতে শরৎচন্দ্র খুব ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন, "এ অবস্থায় আন্দোলনকে স্থগিত রাখার মানে টুঁটি টিপে আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটানো...। এতবড় বিরাট দেশের মুক্তি সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই তো! রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারিদিকে — সেই শোণিত প্রবাহের মধ্যেই তো ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল।"[২৬] রবীন্দ্রনাথের সাথেও তাঁর বিভিন্ন প্রশ্নে মতভেদ হয়েছে এবং স্পষ্ট ভাষায় সেটা তিনি ব্যক্ত করেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথকে গভীর শ্রদ্ধাও করতেন। ঢাকায় কিছু ছাত্র তাঁর লেখার সাথে রবীন্দ্রনাথের রচনার তুলনা করে বলেছিল, আমরা আপনার লেখা বুঝি, ভালো লাগে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা বুঝতে পারি না। শরৎচন্দ্র এই তুলনা পছন্দ করতে পারেননি। তিনি উত্তর দিয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্য, আমি লিখি তোমাদের জন্য।" বৈজ্ঞানিক সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা এবং ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়রা শরৎচন্দ্রকে গভীর শ্রদ্ধায় ঘিরে থাকতেন। ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের, বাংলার বিপ্লবীদের বুকে ছিলেন শরৎচন্দ্র। 'পথের দাবী'কে তাঁরা গীতা গণ্য করতেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবী যোদ্ধা কল্পনা দত্ত আর প্রীতিলতা আলোচনা করেছেন, 'আমাদের মাস্টারদা কি সব্যসাচীর চেয়ে বড়, না সব্যসাচীর মতো'।

কমরেড শিবদাস ঘোষ এই শরৎচন্দ্রকে আমাদের চিনিয়েছেন। আবার গভীর বেদনার সাথে এ কথাও বলে গেছেন, শরৎ সাহিত্যের চর্চা এক সময় যেভাবে হত, আজকের সমাজে সেভাবে হয় না। সেই সময়ে শরৎচন্দ্রের মূল্য দিয়েছিলেন কারা? যাঁদের নাম আগেই বলেছি, তাঁরা স্মরণীয় ব্যক্তি। সে যুগটা হচ্ছে প্রবল স্বদেশি আন্দোলনের যুগ, আত্মাহুতির যুগ, সর্বস্ব দেওয়ার যুগ। সেই যুগেই ঘরে ঘরে পরিবর্তনকামীরা, বিপ্লবীরা শরৎ সাহিত্য চর্চা করেছে। আবার শরৎচন্দ্রের এ দিকটা যারা বুঝতে পারেনি তারাও মুগ্ধ হয়েছে রামের সুমতি পড়ে, বিন্দুর ছেলে পড়ে, নিষ্কৃতি ও মেজদিদি পড়ে। যে ভালোবাসা নিজের রক্ত-মাংসের সম্পর্কের ঊর্ধ্বে,

রক্ত-মাংসের সন্তানের থেকেও মাতৃহীন পিতৃহীন অসহায় দরিদ্র শিশুকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করছে। নিজের সন্তানের থেকেও তার প্রতি অনেক বেশি অপত্য স্নেহের প্রকাশ ঘটেছে। কেউ কেউ এজন্য নিজের স্বামী ও মায়ের বিরুদ্ধেও লড়েছেন। Ethical motherhood-এর এই প্রকাশ দেখে নিতান্ত সাধারণ মানুষও এর দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে নানা দিক থেকে। ঘরে ঘরে বিন্দু, নারায়ণী, মেজদিদি, গিরীশ, রমেশ, যাদবের মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছে।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে যে যুগের সূচনা এবং শরৎচন্দ্র, নজরুলে যার পরিণতি, যে যুগে দেশবন্ধু, সুভাষ বোস, বিপিন পাল, লালা লাজপত, তিলক এবং ভগৎ সিং, সূর্য সেন, ক্ষুদিরামদের নিয়ে ঘরে ঘরে চর্চা হত, ছাত্র-যুবকরা যাঁদের সামনে রেখে নিজেদের গড়ে তোলার সাধনা করত, সেই যুগের ধারাবাহিকতা থেকে আমাদের ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। আজ সর্বাত্মক সংকটের যুগ চলছে। আমি অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে আলোচনা করছি না। একথা ঠিক, শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্তে' যে দুঃখ-দুর্দশার চিত্র এঁকেছেন, 'পথের দাবী'তে যা এঁকেছেন সে চিত্র আজ আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। শরৎচন্দ্র এই ভয়াবহতা দেখেননি। শরৎচন্দ্র দেখেননি বাবা-মা নিজের ছেলে মেয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে, শরৎচন্দ্র দেখেননি, বিয়ের নামে প্রতারণা করে দু-চারদিন বৌকে রেখে তারপর বিক্রি করে দিচ্ছে। শরৎচন্দ্র দেখেননি নারী পাচার হচ্ছে ব্যাপক হারে। শরৎচন্দ্র দেখেননি ঘরের বউরাও অন্ধকার রাতে রাস্তায় নামে, অসুস্থ স্বামী, অভুক্ত সন্তানদের খাওয়াবার জন্য। মেয়েরা রাস্তায় বেরোতে ভয় পায়, অশ্লীল বাক্য, নারী ধর্ষণ ও হত্যা, শিশু কন্যাকেও ধর্ষণ, বৃদ্ধ মহিলাকেও ধর্ষণ — এগুলো রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্ররা দেখে যাননি। আজ দেশ এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছে। আজ ছেলে বাপ-মাকে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে, মেরে খুন করে সম্পত্তি কেড়ে নিচ্ছে। পিতৃত্ব মাতৃত্ব এভাবে লাঞ্ছিত অবমানিত হচ্ছে, তা শরৎচন্দ্ররা দেখে যাননি। আজ আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছে, আজও শরৎচন্দ্রের প্রাসঙ্গিকতা আছে কি না! কারও মতে, আজ আর শরৎ সাহিত্য পাঠের প্রয়োজন তেমন নেই। কিন্তু আমরা তো মনে করি আজ আরও বেশি প্রাসঙ্গিকতা আছে। শরৎ সাহিত্যের যে চিন্তা ও শিল্পশৈলী, যার মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র ধর্মীয় চিন্তা ও ঐতিহ্যবাদকে fight করেছেন, পুঁজিবাদী শোষণের স্বরূপ ও সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার চিনিয়েছেন, এদেশের গ্রামের গরিবের দুঃখ-দুর্দশা আমাদের চিনিয়েছেন, শ্রমিকের যন্ত্রণা চিনিয়েছেন, নারীর ব্যথাযন্ত্রণা চিনিয়েছেন, ভাবিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন, পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছেন, সেক্যুলার মানবতাবাদী রুচি-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সন্ধান দিয়েছেন, সেগুলি আজ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। শরৎচন্দ্র লড়াই করেছেন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। এদেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটলেও বিশ্বে আজও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, পরদেশ আক্রমণ চলছে। এদেশেই পুঁজিবাদী শোষণ-লুণ্ঠন ও অত্যাচার আরও নির্মমরূপ নিয়েছে এবং এই

পুঁজিবাদ সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় চিন্তা ও কুসংস্কারকে আরও জাগিয়ে তুলছে। সেইজন্যই শরৎসাহিত্য চর্চা আরও বেশি প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র অপ্রাসঙ্গিক হবেন তখনই, যখন শরৎচন্দ্র থেকেও আরও বড় কোনও সাহিত্যিক আসবেন, চিন্তায় ও শিল্পশৈলীতে মার্কসবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গিতে।

বর্তমান শাসকশ্রেণীর ষড়যন্ত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সেই যুগ থেকে, আপসহীন ধারা ও বিপ্লবাত্মক চিন্তার যুগ থেকে, শরৎচন্দ্রদের যুগ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তাই মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ গভীর উদ্বেগে বলছেন, আমরা ছিন্নমূল হয়ে গেছি। তিনি আবেদন করেছেন সেই যুগের সাথে আবার যোগসূত্র স্থাপন করার এবং তারপর সেই স্তর অতিক্রম করে আরও উন্নততর সর্বহারা স্তরে উন্নীত হবার। সেইজন্য শরৎচন্দ্র পাঠ করার প্রয়োজন খুব বেশি। নিছক গল্প শোনার জন্য নয়, উন্নত নীতি আদর্শ ও রুচি সংস্কৃতি আহরণ করার জন্য। সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী চরিত্র এঁকেছেন শরৎচন্দ্র, সব্যসাচীকে। শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত সব্যসাচীর থেকেও আরও বড় চরিত্র পেয়েছি আমরা মহান সর্বহারা বিপ্লবী নেতা শিবদাস ঘোষকে। তাঁকে সামনে রেখেই আমাদের এগোতে হবে। আর এগোতে হলে তিনিও যেমন শরৎ সাহিত্য থেকে চিন্তার উপকরণ সংগ্রহ করতেন, রস সংগ্রহ করতেন, আমাদেরও তাই করতে হবে। যাঁরা সমাজে পরিবর্তনকামী ও বিপ্লবী, যাঁরা সমাজকে, মানুষের ব্যথা বেদনাকে বুঝতে চান, উন্নত নৈতিকতার সন্ধান চান, তাঁদের শরৎচর্চা করতে হবে। আজ ১৭ সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্রের জন্ম দিনে দেখছেন, অপসংস্কৃতির বিরাট আয়োজন চলছে চতুর্দিকে বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে। মদ-জুয়া-তাড়ি-ড্রাগ, নারী সম্পর্কে অশ্লীল উক্তি, নারী ধর্ষণ, কিডন্যাপিং, বাবা-মাকে গলা টিপে মারা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, রুচিহীনতা সব নিয়ে চতুর্দিকে যে অন্ধকার সেটা পুঁজিবাদই সৃষ্টি করেছে। আর ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেস, বি জে পি, সি পি এম, তৃণমূল কংগ্রেস সব দলই এটাকে encourage করছে হীন দলীয় স্বার্থে। এরা দাঁড়িয়ে আছে অ্যান্টি-সোস্যালদের উপর। এই রাজনীতির কথা অতি দুঃস্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেনি সেই যুগে। সেদিন ‘স্বদেশি’ শুনলেই সকলের মাথা নিচু হয়ে যেত শ্রদ্ধায়। আমাদের মায়েরা ঘোমটা পরে সশ্রদ্ধ মনে রাস্তায় দেখত স্বদেশিদের, যেন সাধু সন্ন্যাসীর মতন। কারণ এঁরা দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, এঁরা হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করেন। আর আজ নীতিহীন, আদর্শহীন রুচি বিগর্হিত একটা রাজনীতি চলছে, বোমা পিস্তল এক হাতে, অন্য হাতে মদের বোতল আর টাকার থলি এই নিয়ে চলছে এদের রাজনীতি। ফলে এরা চায় বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাক, দেশবন্ধু, সুভাষ বোস, ক্ষুদিরামরা তলিয়ে যাক। আজকের ছাত্র-যুবকদের মনে চিন্তার গভীরতা নেই, ধীর স্থির শান্ত বিচার নেই, আছে একটা হালকা মানসিকতা, একটা অস্থিরতা, নোংরা-কদর্যের প্রতি আকর্ষণ — এরকম একটা মানসিকতা এরা গড়ে তুলছে। অর্থনৈতিক সংকটের চেয়েও এই সংকট

আরও ভয়ঙ্কর। যেটা মনুষ্যত্বের সংকট। যারা ধর্ষণ করছে বা ধর্ষণের মানসিকতা নিয়ে যারা চলে, তারা তো পশুও নয়। পশুরাও তো ধর্ষণ করে না। এই পচা, গলা পুতিগন্ধময় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সৃষ্টি এরা, ওরা মানুষ নয়, পশুও নয়। মানবদেহী মানবিক মূল্যবোধহীন এক ধরনের জীব সৃষ্টি করছে পুঁজিপতিশ্রেণি ও এই রাজনৈতিক দলগুলি। এই তাদের প্রয়োজন। এই তাদের চাই। যেখানে প্রশ্ন নেই, তর্ক নেই, বিচার নেই, মর্যাদাবোধ নেই, ন্যায়-অন্যায় বোধ নেই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর নেই, বিবেক মনুষ্যত্ব নেই। শুধু টাকা আর ফূর্তির নানা উপকরণ, মদ আর মেয়ে মানুষ দিয়েই যাদের খুশি করানো যায়। যৌবনকে এইদিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ।

সেই জন্যই শরৎচন্দ্রের চর্চা চাই। ব্যাপক আলোচনা দরকার, বিতর্ক হওয়া দরকার সাহিত্যগুলি নিয়ে। শুধু শরৎচন্দ্র নয়, সেই যুগ নিয়েই আমি বলছি। সেই যুগের মনীষীদের সঠিক মূল্যায়ন হওয়া দরকার, বিপ্লবীদের মূল্যায়ন হওয়া দরকার, এটা নিয়ে একটা মুভমেন্ট হওয়া দরকার। তাঁদের নিয়ে চর্চা একটা আনুষ্ঠানিক উৎসব হিসাবে যেন না থাকে। এই সব দেখে শুনে খুব কষ্ট পাই যে, শরৎ সাহিত্যের চর্চা নেই, এই সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ নেই। সেই মন কোথায় নিয়ে চলে যাবে। আমার ঐকান্তিক আহ্বান — শরৎচন্দ্র ভালো করে পড়ুন, চর্চা করুন, বুঝুন এবং শরৎচন্দ্রকে নিয়ে ঘরে ঘরে যান। সত্যিকারের যৌবন জাগুক, যৌবনের আন্দোলন জাগুক। দেশ একটা পথ পাবে, মূল্যবোধের একটা আধার তৈরি হবে, তাহলে সর্বহারা বিপ্লবের চর্চা হবে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট যে উন্নত নৈতিক মান, সেটা আমরা অর্জন করতে পারলে, তার পরের ধাপ সর্বহারা বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের দিকে আমরা এগোব। যেখানে ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে,ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত সবকিছু থেকে মুক্ত হবে, ব্যক্তি স্বার্থ আর সমাজ স্বার্থেই সম্পূর্ণ এক হবে। সামাজিক স্বার্থই ব্যক্তির স্বার্থ হবে, বিপ্লবের স্বার্থই ব্যক্তির স্বার্থ হবে। ব্যক্তির নিজস্ব কোনও স্বার্থ বলে আলাদা কিছু থাকবে না। এই যে সাম্যবাদী চরিত্র, স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা সমস্ত কিছুর প্রশ্নেই ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে মুক্ত — এই চরিত্র তখন আসবে, যে আদর্শের সন্ধান কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের দিয়ে গেছেন। কিন্তু তার আগে শরৎচন্দ্র সৃষ্ট যে চরিত্রগুলো, সেইগুলি জানা, বোঝা এবং আহরণ করা, নিজের জীবনে প্রয়োগ করা, এই স্তরে আমাদের উন্নীত হতে হবে। আমি অনেক সময় নিয়েছি। ফলে এই আহ্বান রেখেই আমি আজ শেষ করছি। আগেই বলেছি যে আজকে আমি বলার চেয়ে বেশি পড়ে শোনাতে চাই, কারণ দেখাতে চাই, শরৎচন্দ্রের মধ্যে কি অমূল্য সম্পদ আছে! তাও সেগুলি আমি খুব সামান্যই আপনাদের কাছে রেখেছি। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অনেক অমূল্য রত্ন আছে। ফলে আপনারা পড়বেন, ভাববেন, চিন্তা করবেন, নতুন আন্দোলনের জন্ম দেবেন, একথা বলে আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১। শরৎচন্দ্রের ৬১তম জন্ম তিথি উপলক্ষে ২৫ আশ্বিন, ১৩৪০, রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ।
২। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শরৎ সংখ্যায় প্রেরিত চিঠি।
৩। সত্যাশ্রয়ী।
৪। সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি।
৫। দুটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ।
৬। সাহিত্যের রীতি ও নীতি।
৭। ৫৩তম জন্মদিবস উপলক্ষে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে দেশবাসী প্রদত্ত অভিনন্দনের প্রতিভাষণ।
৮। শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭
৯। ৫৪তম জন্মদিনের ভাষণ
১০। স্বদেশ ও সাহিত্য
১১। সাহিত্য ও নীতি
১২। নারীর মূল্য
১৩। ইলাচন্দ্র যোশীর চিঠির উত্তরে, সূত্র ঃ ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ, বিষ্ণুপ্রভাকর
১৪। দেশসেবা
১৫। স্বরাজ সাধনায় নারী
১৬। 'সুমন্দ ভবন'-এর শ্রীমতী সেনকে লেখা চিঠি। 'বিজলী' ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত।
১৭। রাধারাণী দেবীকে লেখা চিঠি।
১৮। তরুণের বিদ্রোহ, ১৯২৯ সালে রংপুরে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীর সভাপতি হিসাবে ভাষণ।
১৯। বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গে।
২০। 'বেণু' মাসিক পত্রিকার কিশোর পাঠকদের প্রতি।
২১। দেশসেবা
২২। জন্মদিনের ভাষণাবলী
২৩। বাংলা সাহিত্যসভার বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ।
২৪। 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধে
২৫। শরৎ মূল্যায়ণ প্রসঙ্গ — শিবদাস ঘোষ
২৬। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন — শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়